কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত

(১৯৪০ সালের ৫ ডিসেম্বর, কলিকাতা গেজেট দ্রষ্টব্য)

ভারতের শাসন-ব্যবস্থা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক

শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

প্রণীত

চতুর্থ সংস্করণ

ব্যানার্জি এণ্ড কোং

২৫নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা।

১৯৪১

মূল্য এক টাকা ছয় আনা মাত্র

ভূমিকা

এই পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ সম্পূর্ণভাবে পুনর্লিখিত হয়; এই সংস্করণে যুদ্ধ-সংক্রান্ত ও আধুনিক তথ্যাদি সন্নিবেশিত হইয়াছে। শিক্ষক-মহাশয়দের পরামর্শমত বিষয়বস্তুর বিন্যাসও পরিবর্তিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষে কতকগুলি প্রশ্নও সন্নিবেশিত হইল; উহাতে পরীক্ষার্থীদের সুবিধা হইবে বলিয়া ভরসা করি।

এই পুস্তক রচনায় প্রথম উৎসাহদাতা শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট আমার অপরিসীম কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ইহা ভিন্ন শ্রীমান্ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ. ও শ্রীমান্ কান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, এম্. এ. আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য, এই পুস্তকের বিষয়বস্তু শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার লাহিড়ী ও মৎপ্রণীত রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত ইংরাজি গ্রন্থসমূহ হইতে গৃহীত। শিক্ষকমহাশয়গণ প্রয়োজনবোধে উহা দেখিতে পারেন।

১৮-৪ বি, ডোভার লেন,
কলিকাতা
১৫ই জানুয়ারী, ১৯৪১। } গ্রন্থকার

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

ভারতের শাসন-ব্যবস্থা

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

শাসনতন্ত্রের ক্রমবিকাশ

"ভারতবর্ষের মধ্যে একটি বাঁধিয়া তুলিবার ধর্ম চিরদিন বিরাজ করিয়াছে। নানা প্রতিকূল ব্যাপারের মধ্যে পড়িয়াও ভারতবর্ষ বরাবর একটা ব্যবস্থা করিয়া তুলিয়াছে; তাই আজও রক্ষা পাইয়াছে। এই ভারতবর্ষের উপর আমি বিশ্বাস স্থাপন করি। এই ভারতবর্ষ এখনি এই মুহূর্তেই ধীরে ধীরে নূতন কালের সহিত আপনার পুরাতনের আশ্চর্য একটি সামঞ্জস্য গড়িয়া তুলিতেছে।

"ভারতবর্ষের এই গুণ থাকাতে, কোন সমাজকে আমাদের বিরোধী কল্পনা করিয়া আমরা ভীত হইব না। প্রত্যেক নব নব সংঘাতে অবশেষে আমরা আমাদের বিস্তারেরই প্রত্যাশা করিব। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে লড়াই করিয়া মরিবে না—এইখানে তাহারা একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ("স্বদেশী সমাজ")।

উপক্রমণিকা—ব্রিটিশ শাসনে ভারতে যে শাসনতান্ত্রিক ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে, তাহাই আমাদের আলোচনার বিষয়। কিন্তু তাই বলিয়া

ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে ভারতের রাষ্ট্রচেতনা তেমন জাগ্রত ছিল না, একথা মনে করা নিতান্তই ভুল। প্রকৃতপক্ষে, ভারতের রাষ্ট্র-সাধনা অতি পুরাতন। সুদূর বৈদিকযুগেও যে ভারতবর্ষে গণশাসন প্রচলিত ছিল, ইতিহাসেই তাহার সাক্ষ্য মিলিবে।*

উত্তর বৈদিক যুগেও ভারতে একাধিক গণরাজ্য বর্তমান ছিল। এই সময়ে উত্তর বিহারে লিচ্ছবিদের গণতন্ত্র ব্যতীত, কম্বোজে "ভোজ" শ্রেণীর ও সৌরাষ্ট্রে "রাষ্ট্রিক" শ্রেণীর গণতন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুগ রাজন্যবৃন্দের কার্যধারা যে জনসাধারণের মতামতের উপর অল্প-বিস্তর নির্ভর করিত, তাহারও অনেক প্রমাণ রহিয়াছে। প্রজাকর্তৃক রাজ্যাভিষিক্ত ও সিংহাসনচ্যুত রাজার দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়।† বর্তমান কালের মত প্রাচীন ভারতেও রাজা, মন্ত্রী, ব্যবস্থা-পরিষদ ও কর্মচারিদের সহযোগিতায় রাষ্ট্র-শাসন পরিচালিত হইত।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, উত্তর-বৈদিক যুগে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতন্ত্র (Federation)-ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অবশ্য হিন্দু যুগের মাঝামাঝি এই সব খণ্ড গণতন্ত্রগুলি নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য হারাইয়া বৃহত্তর হিন্দু সাম্রাজ্য সমূহের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।

---

* বৈদিকযুগে বিশ্ বা জনসঙ্ঘ ব্যক্তিবিশেষকে রাজপদে নির্বাচিত করিত।

† "হর্ষচরিত"-প্রণেতা বাণভট্ট বলিয়াছেন যে, শেষ মৌর্যরাজ বৃহদ্রথ রাজ্যাভিষেকের সময় যে প্রতিজ্ঞা করেন, পরে তাহা রক্ষা করিতে না পারায় সিংহাসনচ্যুত হন। পিতৃ-হত্যার অপরাধে রাজা নাগদশককে পদচ্যুত করা হয় এবং তাঁহার স্থানে শিশুনাগবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

"মঞ্জুশ্রী-মূলকল্প" নামক প্রাচীন পুস্তকে দেখা যায়, রাজা শশাঙ্কের পরে কিছুকাল বঙ্গদেশে গণতান্ত্রিক শাসন প্রচলিত ছিল। বঙ্গের কৈবর্ত রাজা দিব্যোককে প্রজাগণই সিংহাসনে বসাইয়াছিল। আবার, বিখ্যাত বঙ্গরাজ গোপালদেবও প্রজাকর্তৃকই সার্বভৌম নৃপতিরূপে নির্বাচিত হন।

রাষ্ট্র-বুদ্ধি জাগিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানেরও যে যথেষ্ট চর্চা হইয়াছিল, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। *

এই ত গেল সুদূর অতীতের কথা। খুব বেশী দিনের কথা নয়, মুসলমান যুগেও অন্তত তিন জন নরপতি—আলাউদ্দিন খিলজি, সের শাহ ও আকবর—রাজ্য-শাসনে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এমন কি, ব্রিটিশ আমলেও শিখ ও মারাঠাগণ শাসননৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।

ইংরেজ আমল ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় কাহিনী ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা ও রাজ্য স্থাপনের ইতিহাসের সহিত জড়িত। ইংল্যাণ্ডের রাণী এলিজাবেথের সময়ে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের জনকয়েক ব্যবসায়ীর উদ্যোগে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়। সেই হইতে আজ পর্যন্ত ইংরেজ শাসনে ভারতের যে রাষ্ট্রীয় ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাকে চারি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে; যথা—কোম্পানীর ব্যবসায়ের যুগ, রাজ্য বিস্তারের যুগ, পার্লামেণ্টের শাসনের যুগ ও ভারতীয় শাসনের যুগ।

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহার প্রথম ভাগ। এই ভাগে ইংরেজ ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী পর্তুগাল, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক ও

---

* মহাভারত ও মনুসংহিতায় রাজা ও প্রজার রাষ্ট্র-কর্তব্য সম্বন্ধে নানা বিধান রহিয়াছে। কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে" রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে তের জন লেখক ও পাঁচটি বিভিন্ন রাষ্ট্র-শাসন-প্রণালীর উল্লেখ আছে।

কোন কোন গ্রন্থকারের মতে, প্রজার উপরে রাজার অহেতুকী অধিকার ছিল না; রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ চুক্তিমূলক ছিল; প্রজাদের বশ্যতা ও রাজকরের বিনিময়ে রাজাকে প্রজাদের ধন প্রাণ রক্ষা ও সুবিচার করিতে হইত। রাজা ও প্রজার সম্পর্ককে পিতা ও পুত্রের সম্পর্কের সহিত তুলনা করা হইয়াছে; আবার রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে, এমন কি নররূপী দেবতা বলিয়া মান্য করিবার কথাও আছে।

ফ্রান্সের অনুরূপ ব্যবসায়ী সঙ্ঘের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া কোন কোন ভারতীয় শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতে বাণিজ্য বিস্তার করিতেছিল। অতঃপর ১৭৫৭ সনে, পলাশির যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর কোম্পানী কেবলমাত্র এক ব্যবসায়ী সমিতি হইতে ক্রমে ভারতের অন্যতম রাজশক্তিতে পরিণত হয়।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহার দ্বিতীয় ভাগ; এই সময়ে নানা রাজ্য জয় করিয়া কোম্পানী ভারতের সার্বভৌম রাজশক্তিতে পরিণত হয়

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহি বিদ্রোহের ফলে ব্রিটিশ সরকার কোম্পানীর হাত হইতে ভারতবর্ষের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এই সময় হইতেই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের তৃতীয় অধ্যায় আরম্ভ হয়।

ব্রিটিশ শাসনের চতুর্থ অধ্যায়ের সূচনা হয় ১৯১৯ সন হইতে। ভারতীয়দের স্বায়ত্ত-শাসন লাভের ইচ্ছা পূরণের যৌক্তিকতা ও বিগত মহাসমরে ইংলণ্ডের সাহায্যকল্পে ভারতবাসীর আত্মত্যাগের পুরস্কার স্বরূপ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ১৯১৯ সনে ভারত শাসন-আইন প্রণয়ন করিয়া ভারত শাসনভার আংশিকভাবে ভারতীয়দের হস্তে প্রদান করেন। বর্তমান শাসনতন্ত্রে এই ক্ষমতাই আরও সম্প্রসারিত করিয়া ভারতবর্ষকে একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৫ সনের শাসনতন্ত্রে করদ ও মিত্র রাজ্যগুলিকেও ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশসমূহের সহিত একই ব্যবস্থায় যুক্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এই প্রচেষ্টা ভারতের ইতিহাসে প্রথম।

(ক) **কোম্পানীর ব্যবসায়ের যুগ (১৬০০ - ১৭৫৭)**—অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের সহিত আফ্রিকা ও ইউরোপের বাণিজ্য চলিতেছিল। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কন্‌স্টান্টিনোপল ও তাহার নিকটবর্তী দেশ তুর্কিদের অধিকারের ফলে, পশ্চিম ইউরোপের ব্যবসায়িগণ জলপথে

ভারতে আসিবার চেষ্টা করে। কিছুদিন পরেই পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে, জলপথে ভারতে উপস্থিত হইলেন। সেই হইতে ঐ জলপথেই পশ্চিম ইউরোপ ও ভারতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্য চলিতে থাকে। কিন্তু বিভিন্ন দেশীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে ঐ জলপথেও সংঘর্ষ এবং অত্যাচারের ভয় দেখা দিল। তাই ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য রক্ষার জন্য সামরিক শক্তির প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই উদ্দেশ্যেই ইউরোপীয় বণিকগণ নিজ নিজ সরকারের নিকট হইতে বাণিজ্যের সনন্দ বা রাজকীয় অনুমোদন গ্রহণ করে। ভারতের সহিত বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে **ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী*** রাণী এলিজাবেথের নিকট হইতে "পূর্ব সমুদ্রে একচেটিয়া বাণিজ্যের" সনন্দ লাভ করেন।

একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার ব্যতীত ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী ক্রমে রাজা **দ্বিতীয় চার্ল্স্-এর সনন্দ** অনুসারে (১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে) রাজ্য দখল, দুর্গ নির্মাণ, সৈন্যের সাহায্যে সম্পত্তি রক্ষা, মুদ্রা তৈয়ার ও নিজ উপনিবেশে বিচারের অধিকারও লাভ করে। এই অধিকারের বলেই কোম্পানী রাজ্য দখল ও শাসনের নানা ব্যবস্থাও করিতে লাগিলেন।

(খ) **কোম্পানীর রাজ্য-বিস্তারের যুগ**—১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে কর্ণাটের যুদ্ধে ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে ফরাসীদের পরাজয় হয়। সেই হইতেই ভারতে ফরাসী প্রভাবের অবসান ঘটে। ইংলণ্ডের রাজা

* কোম্পানীর পরিচালনার ভার প্রথমে একজন গভর্নর ও ২৪ জন সভ্য লইয়া গঠিত এক "কোর্ট" বা সমিতির হাতে ছিল। পরে উহা কোম্পানীর অংশীদার সভা (General Court of Proprietors) ও পরিচালক সমিতির (Court of Directors) হস্তে ন্যস্ত হয়। অংশীদার সভার পরিচালক সমিতি-কৃত যে কোন নিয়ম বা ব্যবস্থা বাতিল করিবার ক্ষমতা ছিল।

দ্বিতীয় চার্লস পর্তুগালের রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া বোম্বাই ও সাল্‌সেট্‌ দ্বীপ দুইটি যৌতুক পান, পরে কোম্পানীকে বার্ষিক ১০ পাউণ্ড খাজনায় উহা ইজারা দেন। অন্যদিকে ওলন্দাজদের সিংহল দ্বীপটি ক্রমে কোম্পানীর হস্তগত হয়। এই ভাবে ওলন্দাজ ও পর্তুগীজ বণিকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতাও ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। এ দিকে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশিতে সিরাজ-দ্দৌল্লাকে পরাজিত করিয়া কোম্পানী মিরজাফরকে বাংলার মসনদে প্রতিষ্ঠিত করেন; বিনিময়ে মিরজাফর কোম্পানীকে ২৪ পরগণার জমিদারী সত্ব প্রদান করেন। মিরজাফর নামে মাত্র নবাব হইলেন, কার্যত বাংলার শাসন-ক্ষমতা কোম্পানীর হাতেই রহিয়া গেল। পরে ১৭৬৫ সনে কোম্পানী দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন। কিন্তু ঐ স্থানের ফৌজদারী বিচার ও পুলিশ সম্পর্কীয় শাসন নবাবের হাতেই থাকিয়া যায়। এই সময় হইতে বাংলার নবাব কোম্পানী কর্তৃক নিযুক্ত হইলেও ক্লাইভের ব্যবস্থা অনুসারে সৈন্য ও রাজস্বের ভার কোম্পানীর হাতে রহিল; আর রাজস্ব আদায় এবং পুলিস ও বিচারের ভার রহিল দুজন সহকারী নবাবের হাতে। এইভাবে কোম্পানী শুধু কার্যত নহে, আইনতও শাসন কর্তৃত্ব লাভ করিলেন।

ভারত শাসনে পার্লামেণ্টের হস্তক্ষেপ—এই সময়ে কোম্পানীর কর্মচারিরা বহু ধন সম্পদ উপার্জন করিতে থাকে।* কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে কোম্পানীর অর্থকষ্ট দেখা দিল; পার্লামেণ্ট তখন কোম্পানীকে ১৪ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ মঞ্জুর করেন। দেশের দিকে চাহিলে দেখি, ১৭৬৫-৭১ সনের মধ্যে প্রায় ৪০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের ধনসম্পদ বাংলার বাহিরে গেল; অথচ ১৭৭০ সনে "ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে" বাংলার প্রায় ⅓ লোক মারা যায়। নবাব ও কোম্পানীর পূর্বোক্ত দ্বৈতশাসনের

* শোনা যায়, ১৭৫৭-৬৬ সনের মধ্যে কোম্পানীর কর্মচারিগণ বাংলা হইতে ২১,৬৯,৬৬৫ পাউণ্ড "নজরাণা" বা উপঢৌকন পায়।

ফলে দেশে অরাজকতা দেখা দিল। কোম্পানী-শাসনের এই বিশৃঙ্খলা দেখিয়া ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী লর্ড নর্থ শাসন-সংস্কারের চেষ্টা করেন। তাঁহার চেষ্টার ফলে ১৭৭৩ সনে পার্লমেণ্ট রেগুলেটিং এ্যাক্ট বা নিয়ন্ত্রণ আইন নামে এক আইন প্রণয়ন করেন। এই আইনে ভারতের সুশাসনের সম্পর্কে কোম্পানীকে পার্লামেণ্টের কাছে জবাব দিবার জন্য দায়ী করা হইল। বাংলা প্রেসিডেন্সির * শাসনভার একজন গভর্নর জেনারেল্ ও ৪ জন সভ্য লইয়া গঠিত এক শাসন পরিষদের উপরে ন্যস্ত হইল। বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি দুইটির শাসনভার রহিল দুইজন গভর্নরের হাতে; কিন্তু সন্ধি-বিগ্রহাদি গুরুতর ব্যাপারে তাঁহারা উপরিউক্ত গভর্নর জেনারেলের অধীনেই থাকেন। ইহারা সকলেই নিজ এলাকায় কর সংগ্রহ ও প্রয়োজন মত আইন প্রবর্তন করিতে পারিতেন। কোম্পানীর কর্মচারিদের বিচারের জন্য এই আইন অনুযায়ী কলিকাতায় একটি সুপ্রীম্ কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই আইনে শাসন পরিষদের অধিকাংশ সভ্যের মত অগ্রাহ্য করিয়া গভর্নর জেনারেলের কোন কাজ করিবার ক্ষমতা আছে কিনা, তাহার কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল না। শাসন-বিভাগ ও বিচার বিভাগের কাহার কতটা ক্ষমতা থাকিবে, তাহাও সুনির্দিষ্ট হয় নাই; কেন না গভর্নর জেনারেল কৃত আইন সুপ্রীম্ কোর্ট ইচ্ছা করিলে বাতিল করিতে

* পূর্বে বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ ভিন্নভাবে এক এক জন প্রেসিডেণ্টের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন কাউন্সিল দ্বারা শাসিত হইত; এইজন্য উহাদের প্রেসিডেন্সি বলা হয়।

এই সময়ে শাসন-পরিষদের ৩ জন সভ্য মিলিত হইয়া গভর্নর-জেনারেল হেস্টিংস্-এর কার্য ব্যর্থ করিয়া দিতে লাগিলেন; এবং সুপ্রীম্ কোর্টের প্রধান বিচারক স্যার্ এলিজা ইম্পে (Sir Elijah Impey) সামান্য কারণেও কোম্পানীর কর্মচারিদিগকে তাঁহার নিকটে জবাবদিহি করাইতে লাগিলেন।

পারিত। এই সকল কারণে রেগুলেটিং এ্যাক্ট বদলাইয়া ভারত-শাসনের ক্ষমতা পার্লামেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে আনিবার চেষ্টা হয়।

পিটের ভারত-শাসন আইন—তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী পিটের প্রস্তাবমত ১৭৮৪ সনে পার্লামেণ্ট এক আইন প্রণয়ন করিলেন যে, ভারত-শাসনের জন্য ইংলণ্ডে ছয়জন কমিশনার লইয়া এক বোর্ড-অফ-কণ্ট্রোল গঠিত হইবে। ভারতের সামরিক ও অসামরিক শাসন বা রাজস্ব সম্বন্ধে যাবতীয় কার্য্য ও ঘটনা পর্যবেক্ষণ, পরিচালন ও সংযত করা হইবে বোর্ডের কার্য। *

ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন বড়লাট ও তাঁহার তিনজন পারিষদের (Councillor) উপর ন্যস্ত হয়। বড়লাট প্রয়োজনমত কাউন্সিলরদের মত

১৭৮১ সনে পার্লামেণ্ট ব্যবস্থা করিলেন যে, মফস্বল আদালতের জন্য স-কাউন্সিল গভর্নর-জেনারেল যে আইন করিবেন, সুপ্রীম্ কোর্ট তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না এবং ভারতীয়দের মামলায় ইংল্যাণ্ডের আইনের পরিবর্তে ভারতীয় বিধিব্যবস্থাই কার্যকরী হইবে। ইহাতে বিচার প্রথার সংস্কার হইল বটে, কিন্তু শাসন-ব্যবস্থার দোষ যেমন ছিল তেমনই রহিয়া গেল।

* এই আইন অনুসারে কোম্পানীর অংশীদার-সভা পরিচালক সমিতির সিদ্ধান্ত বাতিল করিবার ক্ষমতা হারাইলেন। পরিচালক সমিতি ও ভারত সরকারের মধ্যে যে চিঠিপত্র আদান প্রদান হইবে, তাহা পর্যবেক্ষণ করিবার অধিকার এই বোর্ডকেই দেওয়া হয়। আরও ব্যবস্থা করা হয় যে, গভর্নর জেনারেল, গভর্নর ও সেনাপতি নিয়োগ করিবার সময় পরিচালক সমিতিকে সম্রাটের অনুমতি লইতে হইবে। বিলাতের রাজস্ব সচিব, একজন সেক্রেটারি-অব্-স্টেট বা রাষ্ট্র সচিব এবং চারিজন প্রিভি-কাউন্সিলের সভ্য লইয়া এই বোর্ড গঠনের ব্যবস্থা হইল। কার্যত, এই বোর্ডের সভাপতির ক্ষমতা বর্তমান ভারত-সচিবের অনুরূপ ছিল। নিম্নতর কর্মচারি নিয়োগ করিবার ক্ষমতা পরিচালক সমিতির হাতেই থাকে; কিন্তু অন্য সব ব্যাপারে বোর্ডের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

অগ্রাহ্য করিয়া কার্য করিবার ক্ষমতা পাইলেন। প্রাদেশিক শাসনের উপরও কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা দেওয়া হইল। প্রাদেশিক শাসনের প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতেই এক একজন গভর্নর ও একজন প্রেসিডেন্সি সেনাপতি এবং তিনজন কাউন্সিলরের ব্যবস্থা করা হয়। উচ্চ আদালতের ক্ষমতাও সুনির্দিষ্ট হইল।

মূলত, পিটের এই আইন অনুসারে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারত-শাসন পরিচালিত হয়।

বিশ-সালা সনন্দ—ইহার পর হইতে প্রতি ২০ বৎসর অন্তর কোম্পানীর সনন্দ পরিবর্তনের সময় শাসন-ব্যবস্থারও সংস্কার হইতে লাগিল। ১৭৯৩ সনে সনন্দ পরিবর্তনের সময় কর্মচারি-নিয়োগ সম্পর্কে চুক্তিমূলক সিভিল্ সার্ভিস্ প্রথার প্রবর্তন হয়। বোর্ড-অব্-কণ্ট্রোলের সভ্যদের বেতন এবং এই বোর্ডের কার্য-নির্বাহের ব্যয় এই সময় হইতে কোম্পানীকেই বহন করিতে হয়। পিটের ভারত-শাসন আইনের দোষ ত্রুটিগুলি এই নূতন সনন্দ আইনে সংশোধন করা হয়।

ইহার পরের সনন্দগুলিতে আরও পরিবর্তন সাধিত হয়। পার্লামেণ্ট স্থির করিলেন যে, কোম্পানীর হাতে একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার থাকিলে সেই স্বার্থে কোম্পানী ভারতীয় প্রজাদের উপর অত্যাচার করিতে পারে। ইহা ছাড়া, অন্য ইংরেজ ব্যবসায়ীরাও কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসায়ে আপত্তি করিল। ফলে, কোম্পানীর প্রতিবাদ সত্ত্বেও ব্যবসায়ের পূর্ব সুবিধাগুলি কোম্পানীর হাতছাড়া হইল; কেবল চা-ব্যবসায়ে ও চীন দেশের সহিত ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার অব্যাহত রহিল। এই সনন্দ অনুসারে ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থায় প্রধান প্রধান কর্মচারিদের নিয়োগ সম্রাটের অনুমোদনসাপেক্ষ করা হয়; নিম্নতর কর্মচারি-নিয়োগের ক্ষমতা কোম্পানীর হাতেই থাকে।

পার্লামেণ্ট ১৮৩৩ সনে এক **চার্টার এ্যাক্ট** বা সনন্দ প্রণয়ন

করেন। ইহাতে কোম্পানী চীনের সহিত বাণিজ্য ও চা-ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকারও হারাইল। প্রতিভূ হিসাবে কোম্পানীকে সম্রাটের ভারতীয় রাজ্যসমূহ আরও বিশ বৎসর কোম্পানীর হস্তে রাখিতে দেওয়া হইল। এতদিন কোম্পানী কেবল একটি বাণিজ্য সমিতি ছিল, ইহা এক শাসক সঙ্ঘে পরিণত হইল। ইহার পর হইতে কোম্পানী ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অধীনে একমাত্র ভারত শাসন কার্যেই ব্যাপৃত থাকে। এই পর্যন্ত বড়লাট বাংলার লাটরূপেই অভিহিত হইতেছিলেন, কিন্তু এই সনন্দ অনুসারে তাঁহাকে "ইংরেজ অধিকৃত ভারতের গভর্নর-জেনারেল" আখ্যা দেওয়া হয়। প্রদেশগুলির জন্য আইন করিবার ক্ষমতাও এই গভর্নর জেনারেলের পূর্বোক্ত পরিষদের উপর অর্পিত হয়। তাঁহার পরিষদের আইন-সচিব নামে এক চতুর্থ সভ্য নিয়োগের ব্যবস্থাও হয়। অন্যদিকে, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি দুইটির আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অপহৃত হয়। এই ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনায় সমগ্র ভারত-শাসন ব্যবস্থা প্রথম প্রবর্তিত হয়।

এই সনন্দ আইনে বলা হয় যে, "ভারতের কোন অধিবাসী বা সম্রাটের কোন সাধারণ প্রজা ধর্ম, জন্মভূমি, বংশ বা বর্ণের জন্য কোন পদ বা চাকুরীর অধিকার হইতে বিচ্যুত হইবে না।" *

কোম্পানীর শেষ সনন্দ—১৮৫৩ সনে আবার সনন্দ পরিবর্তনের সময় আসে; তখন ভারতে কর্মচারি নিয়োগের ক্ষমতা কোম্পানীর ডিরেক্টরদের নিকট হইতে বোর্ড-অব-কন্ট্রোলের হাতে দেওয়া হয়। বাংলা দেশ একজন ভিন্ন লেফ্‌টেন্যান্ট্‌ গভর্নর শাসিত প্রদেশে পরিণত হয়। এই সময়ে প্রদেশসমূহের উপর গভর্নর জেনারেল

* প্রথম আইন-সচিব ও শিক্ষা-বোর্ডের সভাপতি লর্ড মেকলের উদ্যোগে অতঃপর ইংরেজী শিক্ষা প্রচলিত হইতে থাকিলে, এই নীতি অনুযায়ী বহু ভারতবাসী উচ্চতর সরকারি কার্য পাইতে থাকে।

সাধারণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আইনে ইণ্ডিয়ান্ সিভিল সার্ভিসের জন্য মনোনয়নের পরিবর্তে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়। বড়লাট, প্রধান সেনাপতি, বড়লাটের শাসন পরিষদের সভ্য চতুষ্টয়, বাংলার প্রধান বিচারপতি, সুপ্রীম্ কোর্টের একজন বিচারপতি এবং বাংলা, মাদ্রাজ বোম্বাই ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের শাসন-কর্তা কর্তৃক সরকারি কর্মচারি হইতে মনোনীত চারিজন সভ্য, মোট এই বারজন সভ্য লইয়া এক আইন-সভা গঠিত হয়। এই ভাবে প্রথম কার্য নির্বাহক (Executive) বিভাগ ও আইন (Legislative) বিভাগ পৃথক করা হয়। পূর্বে কার্য-নির্বাহক সভাই প্রয়োজনমত আইন করিয়া লইতেন। এইবার সনন্দের মেয়াদ অনির্দিষ্ট রাখা হয় এবং কোম্পানীকে রাজার পক্ষ হইতে ভারত শাসনের অধিকার দেওয়া হয়। কোম্পানীর শাসন যে শেষ হইয়া আসিতেছিল ইহা তাহারই পূর্বাভাষ।

(গ) পার্লামেণ্টের শাসনের যুগ (১৮৫৮-১৯২১)—১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহি-বিদ্রোহের ফলে পার্লামেণ্ট মনে করিলেন যে, বোর্ড-অব্-কণ্ট্রোলের কর্তৃত্বে ভারতে সুশাসন সম্ভব হইতেছে না। তাই বিদ্রোহের অবসান হইলে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট **উন্নততর ভারত-শাসন-আইন"** অনুসারে ভারত-শাসনের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেন। বিলাতের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী স-পার্লামেণ্ট রাজার উপরই ভারত-শাসনের জন্য গভর্নর-জেনারেল লর্ড্ ক্যানিং সম্রাটের প্রতিনিধি শাসক (Viceroy) বলিয়া বিঘোষিত হ'ন। বিলাতে বোর্ড্-অব্-কণ্ট্রোলের স্থলে সেক্রেটারি-অব-স্টেট্ ও ১৫ জন সভ্যযুক্ত তাঁহার এক কাউন্সিল নিযুক্ত হয়। * এখন হইতে ভারত-শাসনের মূল নীতি ও প্রধান প্রধান বিষয়গুলি এই স-কাউন্সিল ভারত-সচিব দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতে লাগিল।

* প্রথমে কিছুকাল ইহার ১৫ জন সভ্যের ৭ জন সভ্য কোম্পানীর পরিচালক সমিতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবার ব্যবস্থা হয়।

ভারতীয় রাজস্ব ব্যয় করিবার অধিকার স-কাউন্সিল সেক্রেটারি-অব্-স্টেটের হাতেই ন্যস্ত হয়। ভারতের প্রধান প্রধান চাকুরিগুলির কর্তৃত্ব ও স-কাউন্সিল ভারত-সচিবের হস্তে দেওয়া হয়। কিছুকাল পরে সেক্রেটারি-অব্-স্টেটের অভিমত তাঁহার কাউন্সিলের মতের বিরুদ্ধেও কার্যকরী হইতে থাকে। সেক্রেটারি-অব্-স্টেট্-ফর্-ইণ্ডিয়াকে ভারত-শাসন-বিষয়ক মন্ত্রিরূপে পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী করা হয়।

ভারতের শাসন-ব্যবস্থা মোটামুটি পূর্বের ন্যায়ই রহিয়া যায়। বড়লাট তাঁহার শাসন-পরিষদের সাহায্যে ভারত-সচিবের কর্তৃত্বাধীনে ভারত-শাসন নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকেন। প্রজাগণের উপর রাজশক্তির যে সার্বভৌম অধিকার আছে তাহার বলেই ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক কোম্পানি এই ভাবে তাহার সাম্রাজ্যগত অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। আনত ১৮৫৮ সনের ভারত-শাসন আইন যুগান্তকারী বলিয়া পরিগণিত।

মহারাণীর ঘোষণা—ভারতের শাসন-ভার গ্রহণ করিয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া এক ঘোষণা করেন। ঘোষণার মূল বিষয়গুলি এই:—তদানীন্তন গভর্নর-জেনারেল লর্ড্ ক্যানিং প্রথম রাজ-প্রতিনিধি (Viceroy) নিযুক্ত হইলেন। ভারতীয় রাজাদের সহিত ঈষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির যে সমস্ত সন্ধি ছিল তাহা মানিয়া লওয়া হইল এবং ইংরেজের আর রাজ্যবিস্তৃতির আকাঙ্ক্ষা নাই, এ কথাও বলা হইল। তিনি ভারতীয় রাজন্যবর্গের স্বত্বাধিকার, মর্যাদা ও সম্মান সম্পূর্ণ মানিয়া চলিবেন এবং শাসনব্যাপারে ভারতীয় ও অ-ভারতীয় প্রজাদের মধ্যে কোন বৈষম্য রাখিবেন না বলিয়া, আশ্বাস দিলেন। ভারতীয় প্রজাদের ধর্মে কোন হস্তক্ষেপ করা হইবে না। ভারতের প্রাচীন আচার, ব্যবহার, সামাজিক রীতি-নীতি এবং প্রচলিত প্রথাসমূহের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইবে

---

* ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজকীয় উপাধি আইন (Royal Titles Act)-এর বলে তিনি ভারত-সম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণ করেন।

এবং জাতিধর্ম-নির্বিশেষে নিরপেক্ষভাবে সকলকে সরকারি চাকুরিতে নিযুক্ত করা হইবে। বিদ্রোহী সিপাহিদিগকে যথাসম্ভব ক্ষমা করা হইবে বলিয়াও আশ্বাস দেওয়া হয়।

স্বায়ত্ব শাসন প্রদানের কোনও প্রতিশ্রুতি না থাকিলেও প্রজাদের মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) সম্বন্ধে অনেক কথাই এই ঘোষণায় রহিয়াছে। এইজন্য ইহা ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় অধিকারের অন্যতম প্রধান দলিল বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

শাসন ব্যবস্থার আলোচনায় ভারতবাসীকে সুযোগ প্রদান—১৮৬১ সনে "**ইণ্ডিয়া কাউন্সিল এ্যাক্ট**" রচিত হওয়ায় শাসন-ব্যাপারে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। এই বিধানে গভর্নর জেনারেলের শাসন-পরিষদে পাঁচজন সভ্য নিয়োগের ব্যবস্থা হয় এবং স্থির হয় যে, ইহাদের মধ্যে একজন পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞ ব্যারিস্টার বা এ্যাড্‌ভোকেট হইবেন। ব্যবস্থাপক সভারও কিছু সংস্কার হয়। ভারত-সরকারের শাসন-পরিষদের সভ্যদের সহিত গভর্নর-জেনারেল কর্তৃক মনোনীত ৬ হইতে ১২ জন সভ্য (ইঁহাদের অন্তত অর্ধেক বে-সরকারী ব্যক্তি হইবেনই) একত্র হইয়া দেশের প্রয়োজনীয় আইন করিবে বলিয়া ব্যবস্থা করা হয়। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশ দুইটিকে গভর্নর-জেনারেলের সম্মতি-সাপেক্ষ আইন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইল। বাংলা, যুক্তপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবেও আইন-সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক প্রদেশে অবশ্য এক একটি কার্য-নির্বাহক সভাও সৃষ্ট হইয়াছিল।

পরে ১৮৯২ সনে ভারত-সচিব লর্ড ক্রসের চেষ্টায় পার্লামেণ্ট এক আইনদ্বারা ব্যবস্থাপরিষদগুলির বে-সরকারী সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। ইহাতে বড়লাটের আইন-সভার সাধারণ সভ্য-সংখ্যা ১২ হইতে ১৬ জনে বর্ধিত হয়; সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক কাউন্সিলের সভ্য-সংখ্যাও বাড়িয়া গেল। বিশ্ববিদ্যালয়, জেলা-বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি

কতকগুলি জন-সংঘ ব্যবস্থা-পরিষদসমূহে প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকার পাইল। * প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচন অধিকার ভারতবাসীকে দেওয়া না হইলেও, আইন-সভাসমূহ এইভাবে কিছু পরিমাণে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব লাভ করে। ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশনকালে সরকারকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও সরকারী বাজেট্ বা আয়-ব্যয়ের হিসাব আলোচনা করিবার অধিকারও আইন-সভাকে দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া, আইন-সভার সভ্যগণ এইবার শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সমালোচনা, প্রস্তাব উত্থাপন ও প্রতিবাদ করিবার অধিকার পাইলেন। এই সময় প্রাদেশিক কাউন্সিলসমূহকে গভর্নর-জেনারেলের মত লইয়া প্রদেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য গভর্নর-জেনারেলের আইন-সভার আইন পরিবর্তনের ক্ষমতাও দেওয়া হয়। ইহাতে প্রাদেশিক কাউন্সিলের ক্ষমতা বাড়িয়া যায়। †

মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার—দেশময় জন-জাগরণের ফলে ভারতীয়দের স্বায়ত্ত-শাসনের তৃষ্ণা বাড়িয়াই চলিল। ইংরাজি শিক্ষার প্রসার ও যাতায়াতের সুবিধা গণশাসন লাভের প্রচেষ্টাকে অনেকখানি সাহায্য করে। এই ক্রমবর্ধমান স্বায়ত্ত শাসনের দাবী পূর্ণ করিবার জন্য ১৯০৯ সনে ভারত-সচিব লর্ড মর্লি ও বড়লাট মিণ্টোর চেষ্টায় পার্লামেণ্টে এক আইন প্রণীত হয়। এতদ্বারা কেন্দ্রীয় আইন-সভায় ৬০ জন অতিরিক্ত সভ্য লওয়া হইল, তন্মধ্যে ২৭ জন সভ্যের

---

* ১৮৯২ সনে লর্ড্ রিপনের সময় নানা জেলায় জেলা-বোর্ড্ ও মিউনিসিপ্যালিটি গড়িয়া উঠে এবং প্রেসিডেন্সি শহরগুলির মিউনিসিপ্যালিটিসমূহে প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা আরও প্রসারিত হয়। ইহারাই পরে আইন সভার ভোটার বা সভ্য-নির্বাচক হন।

† ১৮৮৫ সন হইতে প্রতি বৎসর নব-জাগ্রত জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত ভারতীয়েরা এক কংগ্রেস বা জাতীয় মহাসভায় সম্মিলিত হইয়া স্বায়ত্ত শাসন দাবী করিতে থাকেন। উপরি উক্ত সংস্কার যে অনেকটা এই আন্দোলনেরই ফল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

জন্য নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়। এই আইনে বোম্বাই বাংলাদেশের আইন-সভায় নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যাই বেশী হয়। কিন্তু অন্য প্রদেশে সরকারী সভ্যের সংখ্যা হ্রাস পাইলেও নির্বাচিত সভ্যের সংখ্যা অর্ধেকেরও কম ছিল। বৃহত্তর প্রদেশে আইন সভার সভ্য সংখ্যা হয় ৫০ এবং ক্ষুদ্রতর প্রদেশে ৩০। সভ্যদের আইন-সভায় বাজেট আলোচনা এবং প্রস্তাব, প্রশ্ন ও ভোটের অধিকারও দেওয়া হয়। কিন্তু মুসলমানদের জন্য সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থার প্রবর্তন ও পরোক্ষ নির্বাচন প্রথা বর্তমান থাকার ফলে অনেকেই এই নির্বাচন ব্যবস্থা প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই। এই ব্যবস্থায় কোন নির্বাচন-ক্ষেত্রই (Constituency) ৬৫০ জনের বেশী ভোটদাতা ছিল না এবং প্রাদেশিক সরকারের আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রকৃত ক্ষমতাও কিছু ছিল না। *

এই সময়ে ভারত-সরকার ও প্রতিটি প্রাদেশিক সরকারের কার্য-নির্বাহক সভায় একজন করিয়া ভারতীয় সভ্য গ্রহণের ব্যবস্থাও করা হয়। † এইভাবে ভারতীয়দের হাতে শাসন কার্যের অধিকতর দায়িত্ব দেওয়া হইল বটে, কিন্তু ইহাতে তাহাদের স্বায়ত্ত শাসনের আকাঙ্ক্ষা মিটিল না। কার্য-নির্বাহক সভায় উপরিউক্ত ভারতীয় সদস্যগণ, ব্রিটিশ সরকারের অধীনে ভারতীয় কর্মচারি হিসাবে মাত্র পার্লামেণ্টের নির্দেশ অনুসারের কার্য করিতে বাধ্য রহিলেন। নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত ভারতীয় আইন-সভার, তথা দেশবাসীর, ইচ্ছামত শাসন-পরিচালনার কোন ব্যবস্থাই রহিল না।

* কেন্দ্রীয় আইন-সভায় সরকারী সভ্যের সংখ্যা বেশী থাকায় বে-সরকারী সভ্যের সংখ্যাধিক্যযুক্ত প্রাদেশিক আইন-সভার কার্যও ব্যাহত করা যাইত।

† স্যার্ সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ এইভাবে বড়লাটের কার্যকরী সভার প্রথম ভারতীয় সদস্য নিযুক্ত হ'ন।

দিল্লী-দরবারের ঘোষণা—১৯১১ সনে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্ দিল্লীতে সিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষ্যে দরবারে এক ঘোষণা করেন। সেই অনুসারে ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইল। বাংলাদেশ একজন গভর্নর; বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর একজন লেফ্‌টেন্যাণ্ট্ গভর্নর এবং আসাম এক চিফ্ কমিশনারের শাসনাধীনে ন্যস্ত হইল। বঙ্গ বিচ্ছেদও এই ঘোষণায় রদ হয়। *

(ঘ) **ভারতীয় শাসনের যুগ—মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার** – বিগত মহাসমরে একদিকে সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য ভারতের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত আত্মত্যাগ এবং অপর দিকে ভারতবাসীর স্বায়ত্ত শাসনের তীব্র আকাঙ্ক্ষার কথা মনে করিয়া ১৯১৭ সনের ২০শে আগস্ট্ তদানীন্তন ভারত-সচিব **মিঃ মণ্টেগু** পার্লামেণ্টের কমন্স্ সভায় সরকার পক্ষ হইতে ঘোষণা করেন যে, "শাসনের প্রতি বিভাগে ভারতীয়দের ক্রমবর্ধমান সংযোগ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম আভ্যন্তরীণ অংশরূপে ভারতের ক্রমিক স্বায়ত্ত শাসন লাভই সম্রাটের মন্ত্রীমণ্ডলীর নীতি এবং ইহার সহিত ভারত সরকারও সম্পূর্ণ একমত।" এই সম্পর্কে তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, শাসন-কার্যে ভারতীয়দের সাহচর্য ও দায়িত্ব-জ্ঞানের অনুপাতে ব্রিটিশ-সরকার ভারতবর্ষের স্বায়ত্ব শাসন-বিধির ভবিষ্যৎ উন্নতির পরিমাণ নির্ধারণ করিবেন। ঐ বৎসরই মিঃ মণ্টেগু ভারতে আসিয়া বড়লাট **লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড**-এর সহযোগিতায় এক **শাসন সংস্কার প্রস্তাবনা** (Report) প্রস্তুত করেন। ইহা ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত

* ভারতে সম্রাট্ হিসাবে ইংল্যাণ্ডেশ্বরের ইহাই প্রথম আগমন।

হয়।* পরে এই প্রস্তাবনা অনুসারে ১৯১৯ সনে পার্লামেণ্ট নূতন ভারত-শাসন আইন প্রণয়ন করেন। ১৯২০ সালে এই নব শাসনতন্ত্র অনুসারে নির্বাচন হয় এবং পর বৎসর রাজার পিতৃব্য ডিউক্-অব-কনট্ ভারতের এই নূতন শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।†

১৯১৯ সনের আইন অনুসারে স-পার্লামেণ্ট রাজার পক্ষ হইতে ভারত-সচিব (Secretary of State for India) ভারত-শাসন পরিদর্শন, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করিতেন। একদিকে তিনি যেমন

* এই প্রস্তাবনায় চারিটি মূল নীতি বিবৃত হয়; যথা—(১) স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনে জনসাধারণের পূর্ণ অধিকার থাকিবে; (২) প্রদেশসমূহেই প্রথম স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তনের চেষ্টা করিতে হইবে; (৩) ভারতীয় আইন-সভাকে অধিকতর প্রতিনিধিমূলক ও সভ্য-সংখ্যায় বৃহত্তর করিতে হইবে; এবং সরকারের উপর ইহার প্রভাব বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে, কিন্তু ভারত সরকার ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সম্পূর্ণ অধীনে থাকিবে; (৪) ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনের উপর পার্লামেণ্ট ও সেক্রেটারি-অব-স্টেটের কর্তৃত্ব ক্রমে হ্রাস করিতে হইবে।

† ১৯২১ সালে নূতন আইন-সভার উদ্বোধনের সময়ে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ডিউক-অব-কনটের দ্বারা যে রাজবার্তা প্রচার করেন, তাহাতে বলা হয় যে, "আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-মধ্যে ভারতীয় **স্বরাজের** প্রথম উন্মেষ হইল; এতদ্বারা **ঔপনিবেশিক মর্যাদা** লাভের পথ সুগম হইল।" ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বরাজ দেওয়াই যে সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল, তাহা ১৯২৯ সনে গভর্নর জেনারেল লর্ড আরউইনের এক ঘোষণায় ব্যক্ত হয়।

১৯২৯ সালের এই ঘোষণার পূর্বে ১৯২৬ সনে সাম্রাজ্য সম্মেলন (Imperial Conference)-এর সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্রিটিশ উপনিবেশ সমূহের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিষয়ে পার্লামেণ্টের পূর্ব কর্তৃত্ব লোপের ব্যবস্থা হয় এবং প্রত্যেক উপনিবেশই সম্রাটের নামমাত্র অধীনে, কিন্তু কার্যত স্বাধীন গণতন্ত্রে পরিণত হইল। এই ব্যবস্থাই ঔপনিবেশিক মর্যাদা (Dominion Status) নামে পরিচিত।

পার্লামেণ্ট ও রাজার নিকট ভারত-শাসনের জন্য দায়ী ছিলেন, অন্যদিকে বড়লাট আবার তাঁহার নিকট ঐ জন্য সর্বতোভাবে দায়ী ছিলেন। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন-সভা-প্রণীত সমস্ত আইনেই তাঁহার সম্মতি প্রয়োজন হইত।

ভারত-সচিব পার্লামেণ্টের একজন সভ্য মাত্র; ভারত-শাসনের নানা জটিল ব্যাপারে তাঁহার প্রত্যক্ষ কোন অভিজ্ঞতা না থাকাই স্বাভাবিক। তাই তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য ইণ্ডিয়া কাউন্সিল নামে এক পরিষদ ছিল। ভারতের ঋণ, রাজস্বগ্রহণ নানাবিধ চুক্তি ও সিভিল্ সার্ভিসে নিয়োগ প্রভৃতিতে ভারত-সচিবকে ইহার পরামর্শ মত কার্য করিতে হইত। ভারত-সচিবের নির্দেশ অনুযায়ী এই কাউন্সিল্ ৮ হইতে ১২ জন সভ্য লইয়া গঠিত হইত। বিধান থাকে যে, ইহাদের মধ্যে অর্ধেক সভ্যের কমপক্ষে দশ বৎসর ভারতীয় সরকারী কার্যে অভিজ্ঞতা বা ভারতবর্ষে অবস্থিতি অপরিহার্য গুণরূপে বিবেচিত হইবে। ইহাদের কার্যকাল পাঁচ বৎসর নির্ধারিত হয়। এই আইনে ভারত-সচিবের বেতন পূর্বের মত ভারত হইতে না দিয়া, ব্রিটিশ রাজস্ব হইতে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

১৯২০ সনে ভারত সরকারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়, ভারতীয়-বাণিজ্য-স্বার্থ রক্ষা ও বিলাতে অবস্থিত ভারতীয় ছাত্রদের তত্ত্বাবধান ইত্যাদি কার্যের জন্য, উপনিবেশ সমূহের অনুকরণে, সম্রাটের নির্দেশে ইংল্যাণ্ডে এক হাই-কমিশনারের পদও সৃষ্ট হয় এবং ইহার বেতনাদি ভারত সরকারের তহবিল হইতে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। *

ভারতের **কেন্দ্রীয় শাসন কার্যের** ভার বড়লাট ও প্রধান সেনাপতি সহ ৮ জন কার্য-নির্বাহক সভ্যের হাতে রাখা হয়। আইনে

* এই কমিশনারের বাৎসরিক বেতন ছিল ৩০০০ পাউণ্ড

অবশ্য এই কার্য-নির্বাহক সভার সভ্যসংখ্যা নির্দিষ্ট হয় নাই। বৈদেশিক ও রাজনৈতিক বিভাগ বড়লাটের নিজ শাসনাধীনে থাকে। সৈন্যবিভাগ রহিল প্রধান সেনাপতির হাতে এবং স্বরাষ্ট্র বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ, আইন বিভাগ, বাণিজ্য ও শ্রম বিভাগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগ ও যানবাহন বিভাগ অপর সাত জন সভ্যের হাতে রাখা হইল। ইঁহারা সকলেই পাঁচ বৎসরের জন্য সম্রাট্ কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন এবং ইঁহাদের মধ্যে অন্তত তিনজন সভ্য ভারতীয়দের মধ্য হইতে নিযুক্ত করার ব্যবস্থাও হয়। এই সভ্যগণ সকলেই বড়লাট ও ভারত সচিবের নিকট নিজ নিজ কার্যের জন্য দায়ী ছিলেন। দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্বন্ধ, মুদ্রা, বাণিজ্য-শুল্ক, রেলপথ, আয়কর, ডাক ও টেলিগ্রাফ এবং ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন প্রভৃতি ৪৪টি বিষয় ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন ছিল। উহাদের কয়েকটির মারফৎই কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের ব্যবস্থা ছিল।

কেন্দ্রীয় আইন-সভা **রাষ্ট্র-পরিষদ** (Council of State) নামক এক উচ্চতর পরিষদ ও **ব্যবস্থা পরিষদ** (Legislative Assembly) নামে এক নিম্নতর পরিষদে বিভক্ত হয়। বড়লাটের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেমন কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদের সভ্যগণ কোন কার্য করিতে পারিতেন না, তেমনই কেন্দ্রীয় আইন-সভাও কোন আইন করিতে পারিত না। রাষ্ট্র-পরিষদে ৩৩ জন নির্বাচিত ও ২৭ জন মনোনীত সভ্য ছিলেন। ব্যবস্থা পরিষদে ন্যূনপক্ষে ১৪০ জন সভ্য থাকার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উহাতে ১৪৬ জন সভ্য হন। তন্মধ্যে ১০৫ জন নির্বাচিত এবং ৪১ জন মনোনীত। এই মনোনীত সভ্যদের মধ্যে ২৬ জন সরকারী ও ১৫ জন বে-সরকারী। উভয় পরিষদের নির্বাচনেই সম্প্রদায় হিসাবে আসন বণ্টনের ব্যবস্থা ছিল এবং ভোটদাতার সংখ্যাও বর্তমান আইনের তুলনায় কম ছিল। রাষ্ট্রীয় পরিষদ পাঁচ বৎসরের জন্য ও ব্যবস্থা-পরিষদ তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইত। রাষ্ট্র-

পরিষদের সভাপতি গভর্নর জেনারেল কর্তৃক মনোনীত হইতেন, কিন্তু ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি সভ্যরাই নির্বাচন করিতেন। সকল আইনের প্রস্তাবই উভয় পরিষদের নিকট উপস্থাপিত হইবার ব্যবস্থা ছিল এবং বাজেট্ সম্বন্ধেও ঐ ব্যবস্থাই করা হয়। পরিষদ দুইটির মধ্যে আইনের প্রস্তাব সম্পর্কে মতের অমিল ঘটিলে বড়লাট কর্তৃক উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশন আহ্বানের ব্যবস্থা ছিল ; কিন্তু ঐরূপ অধিবেশন কখনও আহূত হয় নাই। কার্য-নির্বাহক বিভাগের সিদ্ধান্ত সমূহের মত এই আইন-সভারও যাবতীয় সিদ্ধান্ত বড়লাট বাতিল করিতে পারিতেন। বড়লাটের সমস্ত কার্যই আবার সেক্রেটারি-অব-স্টেট্ উপরস্থ কর্তৃপক্ষ হিসাবে বাতিল করিতে পারিতেন।

প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি কতিপয় বিভাগের শাসন আইন-সভার নিকট দায়ী মন্ত্রীদের অধীনে **হস্তান্তরিত** হয়। পুলিশ, জেল, রাজস্ব, বিচার প্রভৃতি কতিপয় বিভাগ গভর্নর ও বড়লাটের নিকট দায়ী কার্য-নির্বাহক বিভাগের সভ্যদের হস্তে **সংরক্ষিত** ছিল। প্রাদেশিক শাসন এইরূপে দুই ভাগে ভাগ হওয়ার জন্যই ইহাকে **দ্বৈত শাসন** (Dyarchy) বলা হইত। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে প্রাদেশিক সরকারকে যে কার্য করিতে হইত তাহাও কার্য-নির্বাহক বিভাগের হস্তেই সংরক্ষিত ছিল। সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত এই উভয় বিভাগের উপর গভর্নরের সাধারণ কর্তৃত্ব থাকিলেও রাজ্যরক্ষার কারণ ব্যতীত মন্ত্রীর অধীনস্থ হস্তান্তরিত বিষয় সমূহে সাধারণত তিনি হস্তক্ষেপ করিতেন না। উপরিউক্ত সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত উভয় শ্রেণীর বিষয়সমূহ হইতেই প্রাদেশিক সরকারের আয়ের ব্যবস্থা ছিল।* কেন্দ্রীয় সরকারের মত প্রাদেশিক সরকারও ঋণ গ্রহণ করিতে পারিতেন।

* এই সব বিষয় হইতে বাংলা সরকারের বাৎসরিক আয় প্রায় ১০ কোটি টাকা ছিল।

প্রাদেশিক আইন-সভা তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইত। * ভূমি-রাজস্ব, কৃষি, শিক্ষা প্রভৃতি প্রাদেশিক বিষয় ব্যতীত, কেন্দ্রীয় বিষয়ে প্রাদেশিক আইন-সভা আইন করিতে পারিত না। প্রাদেশিক কাউন্সিল সমূহে সরকারী কর্মচারিদের মধ্য হইতে শতকরা ২০ জনের বেশী সভ্য লওয়া হইত না; এবং সরকার কর্তৃক মনোনীত বে-সরকারী বাদ দিলেও প্রাদেশিক আইন-সভাগুলিতে বে-সরকারী নির্বাচিত সভ্যের সংখ্যাই অধিক হয়। এই আইনে প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থায় ভারতীয়েরা কিছু শাসন-ক্ষমতা লাভ করিলেও, কেন্দ্রীয় সরকার আগের মতই এবারেও তাহাদের ক্ষমতার বাহিরেই রহিয়া গেল।

গভর্নর শাসিত প্রদেশ হিসাবে গণ্য হইবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত বেলুচিস্থান, আন্দামান, দিল্লী প্রভৃতি কতিপয় অঞ্চলের শাসন বড়লাটের অধীনে চিফ্ কমিশনারগণ কর্তৃক পরিচালিত হইত।

দেশের **বিচার কার্য** কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানের হাইকোর্টসমূহ কর্তৃক পরিচালিত হইত এবং সেখান হইতে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল চলিত। †

* ভারতীয় প্রাদেশিক আইন-সভাসমূহে মোট প্রায় ৭০ লক্ষ ভোটার ছিল। বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় (Legislative Council) ১৪৪ জন সভ্য ছিলেন। আসাম ব্যবস্থাপক-সভার সভ্যসংখ্যা ছিল ৫৩।

† এই হাইকোর্টগুলির মধ্যে একমাত্র কলিকাতা হাইকোর্ট্ প্রাদেশিক সরকারের কর্তৃত্বের বাহিরে, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ছিল। এই সকল হাইকোর্টের নিম্নে প্রতি জেলায় জেলাকোর্ট্, মুন্সেফ কোর্ট প্রভৃতি নিম্ন বিচারালয়রূপে কার্য করিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতীয় করদ ও মিত্ররাজ্যের পরিচয়

১৯১৯ সালের মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার ভারতীয়দের স্বায়ত্ত শাসনের আকাঙ্ক্ষা এতটুকুও পরিতৃপ্ত করিতে পারে নাই। অবশেষে ১৯৩৫ সালে পার্লামেণ্ট এক অভিনব ভারত-শাসন আইন প্রণয়ন করেন। ইহাতে একটি নিখিল-ভারত-যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় করদ ও মিত্র রাজ্যগুলিও যোগদান করিতে পারিবে। শুধু তাহাই নহে, দেশীয় রাজ্য সমূহের মোট জনসংখ্যার অন্তত অর্ধেক লোক সম্বলিত রাজ্য যোগদান না করিলে, যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনাই অসম্ভব। কাজেই ১৯৩৫ সালের নূতন ভারত-শাসন আইন আলোচনার পূর্বে এই সমস্ত করদ ও মিত্র রাজ্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন।

পরোক্ষভাবে সমগ্র ভারতবর্ষ ব্রিটিশ অধীন হইলেও, ভারতের সকল অংশই ব্রিটিশ সরকার প্রত্যক্ষভাবে শাসন করেন না। যে সমস্ত অংশে কোন প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসন নাই, তাহারা ভারতীয় রাজ্য নামে পরিচিত। এই অঞ্চলসমূহ আভ্যন্তরীণ শাসন সম্পর্কে অনেকখানি স্বাধীন। ধ্বংসোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্য হইতেই ইহাদের সৃষ্টি। এই ভারতীয় রাজ্যের নৃপতিগণ অনেকেই লর্ড ওয়েলেস্‌লির অধীনতামূলক মিত্রতা (subsidiary alliance) গ্রহণ করিয়া ব্রিটিশের সামন্তরাজরূপে পরিগণিত হন। * ১৮৭৭ সনে মহারাণী ভিক্টোরিয়া নিজেকে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের ও এই সমস্ত রাজ্যের সম্রাজ্ঞী বলিয়া ঘোষণা করেন। সংখ্যায় এই সমস্ত রাজ্যগুলি প্রায় ৭ শত। ইহাদের মধ্যে প্রায় ১ শত রাজ্যের

* নেপালের বৈদেশিক সম্বন্ধ বৃটিশ-রাজ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইলেও, নেপাল এইরূপ "অধীনতামূলক মিত্রতা" সম্পন্ন সামন্ত রাজ্য নহে।

আভ্যন্তরীণ শাসন ব্রিটিশ সরকারের এজেন্ট্‌গণই অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। অবশিষ্ট ৫৮৪টি সামন্তরাজ্যের অপেক্ষাকৃত বেশী আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা রহিয়াছে। ইহারাই এখন প্রকৃত দেশীয় রাজ্য রূপে গণ্য। আয়তনে এই রাজ্যগুলি ভারতের প্রায় ২/৫ অংশ এবং তাহাদের লোকসংখ্যা সমগ্র ভারতের প্রায় ১/৪ অংশ। হায়দ্রাবাদ রাজ্যের বিস্তৃতি প্রায় সমগ্র ইটালীর সমান, আবার শিমলা পাহাড়ের রাজ্যগুলির পরিধি মাত্র কয়েক মাইল। মোটামুটি, দেশীয় রাজ্যের মধ্যে ৪০টির সহিত ভারত সম্রাট সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ এবং এই সন্ধিবলেই নিজ এলাকা মধ্যে ইহাদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার রহিয়াছে; এবং ১৪০টির আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সম্রাটের সনন্দ-প্রদত্ত। অবশিষ্ট রাজ্যসমূহের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা সম্রাট্‌ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। *

সম্রাট্‌ বিভিন্ন রাজাকে বিভিন্ন শ্রেণীর উপাধি দিয়াছেন। ইহাদের সন্ধি-সনদগত ক্ষমতাও এক নহে। পূর্বে কোন কোন রাজ্যকে ব্রিটিশ সরকারের জন্য সামরিক সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে হইত; ইহার

* পূর্বে ইহাদের মধ্যে ৫টি প্রধানতর রাজ্য মাত্র ভারত-সরকারের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পত্র ব্যবহার করিতে পারিত, বাকী রাজ্যসমূহ গভর্নর জেনারেলের এজেন্টের সহিত বা প্রাদেশিক সরকারের সহিত পত্র ব্যবহারে অধিকারী ছিল। কিন্তু মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কারের সময় বহু রাজ্যই ভারত-সরকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রাখিবার অনুমতি পায়। তথাপি প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গে প্রায় কুড়িটি রাজ্যের সম্বন্ধ রহিয়াই গেল। দেশীয় রাজ্যদের সম্বন্ধে ভারতীয় আইন-সভা, এমন কি, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টও কোন আইন করিতে পারিতেন না। ইহাদিগকে ব্রিটিশ ভারতের বাহিরে ধরা হইত এবং ইহাদের প্রজাদিগকেও ব্রিটিশ ভারতীয় প্রজারূপে গণ্য করা হয় নাই। কিন্তু ভারতের বাহিরে এই সব দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীরা ব্রিটিশ প্রজারূপেই পরিগণিত হইয়াছে।

পরিবর্তে কোন কোন রাজ্য ব্রিটিশ সরকারকে ভূভাগ বিশেষ ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই ভাবেই ইংরেজগণ হায়দ্রাবাদ হইতে বেরার প্রদেশ লাভ করেন; আবার কোন কোন রাজ্য নগদ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ব্রিটিশ সরকারের নিকট হইতে অন্যবিধ সুবিধার বিনিময়ে কোন কোন রাজ্য ব্রিটিশ সরকারকে নির্দিষ্ট অর্থ দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। কতগুলি রাজ্য আবার ব্রিটিশের সার্বভৌম কর্তৃত্ব স্বীকারের নিদর্শন স্বরূপ ব্রিটিশরাজকে রাজকর দিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই সকল করই সম্রাটের ভারত সরকারের তহবিলে যায়; এইভাবে দেশীয় রাজ্য হইতে ভারত সরকারের বৎসরে মোট প্রায় ৬৳ লক্ষ টাকা প্রাপ্য হয়। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, বরোদা, গোয়ালিয়র প্রভৃতি কতিপয় রাজ্য নিজেরাও কয়েকটি ক্ষুদ্রতর দেশীয় রাজ্য হইতে কর পাইয়া থাকে।

মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড্ রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে এই সব রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করিবেন না। গোড়ার দিকে এইরূপ চুক্তিই হইয়াছিল, কিন্তু ক্রমে ইহাদিগকে ব্রিটিশ রাজ্যের অধীনে আনা হইয়াছে। দেশীয় রাজ্যে শান্তিরক্ষা এবং ইহাদের সামরিক ও বৈদেশিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করা ব্রিটিশ রাজ্যের অন্যতম কর্তব্য। এই কর্তব্য যথাযথ পালন করিতেই ব্রিটিশ সরকারকে দেশীয় রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ বিষয়েও হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে। ঐ সকল রাজ্যকেও তাহা নির্বিবাদেই মানিয়া লইতে হইয়াছে। *

---

* দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ১৮৮৯ সালে রাশিয়ার সহিত ষড়যন্ত্র করার সন্দেহে কাশ্মীর-রাজ সিংহাসনচ্যুত হন; এবং ১৮১৫ সনে কু-শাসনের অভিযোগে বরোদার গাইকোয়ার সিংহাসন হারাইলেন। কয়েক বৎসর পূর্বেও নাভা, ইন্দোর ও আলোয়ারের মহারাজা পদচ্যুত হইয়াছেন। মণিপুর রাজ্য সম্বন্ধেও ১৮৯১ সনে ভারত সরকার ঘোষণা

জেল, পুলিশ, বিচার প্রভৃতি বিষয়ে ব্রিটিশ প্রদেশসমূহের মতই এই সব রাজ্যের স্বাধিকার রহিয়াছে। এমন কি, রেলওয়ে, ডাক-বিভাগ, মুদ্রা, লবণ, বহির্বাণিজ্য, শুল্ক ও আফিম ইত্যাদি ব্যাপারেও ইহাদের অধিকার আছে। এই জন্যই এই সব রাজ্যের আংশিক রাজ-কর্তৃত্ব আছে বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে। দেশীয় রাজ্যগুলি ব্রিটিশ ভারতীয় রেলওয়ে লাইনের নিমিত্ত স্থান দিতে বাধ্য; হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, যোধপুর ও বিকানীরে দেশীয় রাজ্যের ভিন্ন রেলওয়ে আছে। কাথিয়াওয়ার প্রভৃতি কতিপয় সমুদ্রতীরস্থ রাজ্যের বহির্বাণিজ্য শুল্ক সম্বন্ধীয় অধিকার আছে। প্রায় প্রত্যেক রাজ্যেরই নিজ নিজ বিচারাধিকার রহিয়াছে; কিন্তু ব্রিটিশ সরকার কোন ইংরেজ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিচার রাজ্যস্থ ব্রিটিশ কোর্ট বা ব্রিটিশ ভারতীয় কোর্টে পরিচালনার দাবী করিতে পারেন। ১৮৬৯ সালে ব্রিটিশ ভারতীয় সরকার ও কতিপয় দেশীয় রাজ্যের মধ্যে যে সন্ধি হইয়াছে, তাহাতে এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে অপরাধীদের গমনাগমন নিয়ন্ত্রণ করিতে তাঁহারা বাধ্য। ৮টি রাজ্যে মুদ্রা তৈয়ার হয় এবং ঐ মুদ্রা কেবল তাহাদেরই এলাকায় চলিয়া থাকে; অপর কয়েকটি রাজ্যে সাধারণ তাম্র মুদ্রা প্রস্তুত হয় মাত্র। ভারত সরকারের কর্মচারির তত্ত্বাবধানে কতগুলি রাজ্যে সৈন্য রহিয়াছে; কিন্তু রাজ-সমূহের যুদ্ধ-বিগ্রহাদি আন্তর্জাতিক বিষয়ে ক্ষমতা না থাকায়, এই সৈন্যদিগকে সশস্ত্র পুলিশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাদের ব্যয়-ভার কিন্তু রাজ্যসমূহকেই বহন করিতে হয়। সকল রাজ্যই ব্রিটিশ ভারতীয় টেলিগ্রাফ-ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু উহাদের ১৫টির নিজ নিজ পোষ্ট আফিস্ আছে।

সামরিক ও বৈদেশিক অধিকার না থাকায়, এই সব রাজ্যের

করেন যে, স্বাধীন রাজ্যের প্রাপ্য মর্যাদা ব্যবহারের অধিকার হারাইয়া মণিপুর এখন হইতে সম্রাটের অধীনস্থ রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।

কোন আন্তর্জাতিক অস্তিত্বই কিন্তু স্বীকার করা হয় না, অবশ্য বিগত মহাসমরের সময় হইতে এই বিষয়ে রাজ্যসমূহ কিছুটা অধিকার পাইয়াছে। মহাসমরে দেশীয় রাজ্যসমূহ ইংরেজকে বিশেষরূপে সাহায্য করায় ভের্সাই সন্ধিপত্র (Treaty of Versailles) দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি হিসাবে বিকানীরের মহারাজাকে স্বাক্ষর করিতে দেওয়া হয়। সেই হইতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক সম্মেলন (Imperial Conference) ও রাষ্ট্রসঙ্ঘ (League of Nations) প্রভৃতি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে রাজন্যবর্গ হইতে কখনও কখনও প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক কর্তৃত্ব নাই বলিয়া, ইঁহারা ভারত-সরকারের কর্তৃত্বাধীনে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে যুক্তভাবে এই সব প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধি পাঠাইয়া থাকেন। ইঁহাদের যে পূর্ণ রাজকীয় ক্ষমতা নাই তাহার আর একটি প্রমাণ এই যে, ইঁহাদের সমস্ত উত্তরাধিকার নির্ধারণেই সম্রাটের সম্মতি প্রয়োজন। এই সব রাজ্যগুলির নৃপতিমণ্ডল নিজ নিজ রাজ্যে বংশানুক্রমিকভাবে স্বেচ্ছামত শাসন পরিচালনা করিয়া আসিতেছিলেন। নৃপতিরা স্বেচ্ছামত নির্বাচিত পরিষদ বা মন্ত্রীর সাহায্যে (অবশ্য সম্রাটের চরম কর্তৃত্বাধীনে) ইচ্ছানুযায়ী ট্যাক্স্ উঠাইয়া রাজ্য মধ্যে শাসন-কার্য ও বিচার চালাইয়া থাকেন। সাধারণত একজন ব্রিটিশ এজেণ্ট ইঁহাদের কায-কর্ম পর্যবেক্ষণ করেন। নিতান্ত অশান্তি ও শাসন-ভঙ্গের আশঙ্কা দেখা দিলে, সম্রাটের পক্ষে ভারত সরকার হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন।

সম্প্রতি এই রাজ্যসমূহে গণতান্ত্রিক আন্দোলন সুরু হইয়াছে। এই গণতান্ত্রিক জন-জাগরণে বাধা দিলেও শেষ পর্যন্ত রাজন্যবর্গকে গণ-তান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দিতে হইয়াছে। সাধারণতঃ স-কাউন্সিল গভর্নর জেনারেলের সম্মতি ছাড়া রাজ্যের আইন বা শাসন-ব্যবস্থা পরিবর্তিত হইতে পারে না। মহীশূর, বরোদা ও হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি

৪০টি উন্নততর রাজ্যে আংশিক নির্বাচিত আইন-সভা স্থাপিত হইয়াছে; মহীশূরে ২ জন এবং ত্রিবাঙ্কুরে ১ জন বে-সরকারী মনোনীত মন্ত্রীও আছেন। কতকগুলি রাজ্যে কার্য-নির্বাহক-সভা ও আইন-সভা পৃথক্ করা হইয়াছে; কিন্তু শাসন-কার্যের সাধারণ সমালোচনা ছাড়া এই সকল আইন-সভার রাজাকে কোন কার্যে বাধ্য করিবার ক্ষমতা নাই। ৪০টির অধিক রাজ্যে আধুনিক বিচার-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এই সব কোর্টে অনেকটা ব্রিটিশ ভারতের অনুরূপ আইনই অনুসৃত হয়।

মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্ট অনুসারে ১৯২১ সালে রাজকীয় ঘোষণা দ্বারা **নরেন্দ্র মণ্ডল** (Chamber of Princes) সংস্থাপিত হয়। রাজ্যসমূহের সাধারণ স্বার্থ সম্বন্ধে ঘরোয়া আলোচনা এবং বিভিন্ন রাজ্য ও ব্রিটিশ সরকার সম্পর্কিত বিষয়ে পরামর্শ দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য। ইহার কিন্তু কোন কার্যকরী ক্ষমতাই নাই। অন্তত ১১টি সম্মানাত্মক তোপধ্বনি পাইয়া থাকেন এমন ১০৮ জন রাজা ও অপর ১২৭টি রাজ্যের প্রতিনিধি লইয়া এই নরেন্দ্র-মণ্ডল গঠিত। হায়দ্রাবাদ, কাশ্মীর, মহীশূর, বরোদা প্রভৃতি কতিপয় প্রধানতম রাজ্য ইহার সভ্য হয় নাই। গভর্নর-জেনারেলই ইহার সভাপতি; কিন্তু সভ্যবৃন্দ প্রতি বৎসর নিজেদের মধ্য হইতে ইহার চ্যান্সেলর্ ও প্রো-চ্যান্সেলর্ নির্বাচন করিয়া থাকেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নূতন শাসন তন্ত্রের স্বরূপ

শাসন সংস্কারের পুনরায়োজন—১৯১৯ সনের ভারত-শাসন আইন অনুসারে শাসন-ব্যবস্থা নানা বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়। প্রাদেশিক সরকার সমূহের অর্থাভাব এবং দ্বৈতশাসনমূলক প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার নানা অসুবিধা শাসন-সংস্কারকে একদিকে গঠনমূলক কার্যের অন্তরায় করিয়া তোলে। অন্যদিকে, মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কার অপর্যাপ্ত মনে করিয়া, মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে ভারতীয় রাষ্ট্র মহাসভা (Indian National Congress) ১৯২১ সালে ইহা বর্জন করে। কিন্তু তিন বৎসর পরে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অধিনায়কতায় রাষ্ট্র মহাসভার স্বরাজ্য দল আইন-সভাসমূহে যোগদান করিলেন। ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কারে ব্যর্থতা প্রতিপন্ন করাই ছিল ইঁহাদের উদ্দেশ্য। ১৯২৫ সনে রাষ্ট্র সহাসভার স্বরাজ্য দলনায়ক পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে "জাতীয় দাবী" উপস্থিত করেন। কার্যত তাহাদ্বারা ঔপনিবেশিক স্বরাজই দাবি করা হয় এবং ইহার উপায় নির্ধারণের জন্য ব্রিটিশ সরকার ও ভারতীয় প্রতিনিধিদের এক গোল-টেবিল বৈঠক আহ্বানের প্রস্তাবও করা হয়।

এইভাবে ভারতে রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদী আন্দোলন দিন দিন বাড়িয়াই চলিল। তাই ব্রিটিশ সরকার লর্ড আরুউইনের ভারত-শাসন কালে সাত জন মাত্র ব্রিটিশ সভ্য লইয়া স্যর্ জন্ সাইমনের সভাপতিত্বে ১৯২৭ সালে এক **তদন্ত কমিশন্** নিয়োগ করেন। শিক্ষা ও

---

*. ব্রিটিশ সম্রাট ও সরকারের অনুমোদনেই কমিশন্ নিযুক্ত হয়, কমিটি কিন্তু ভারত সরকার বা প্রাদেশিক সরকারও বসাইতে পারেন।

প্রতিনিধি মূলক শাসনের প্রসার এবং স্বায়ত্ব-শাসন প্রবর্তনের পরিমাণ প্রভৃতি সম্বন্ধে মন্তব্য দাখিল করাই ছিল এই কমিশনের নির্ধারিত কর্তব্য। পরে দেশীয় রাজ্যের সহিত ব্রিটিশ প্রদেশসমূহের সংযোগ সাধনের উপায় নির্দেশও ইহার অন্যতম কর্তব্যরূপে নির্দিষ্ট হয়। *

এই সময়ে বড়লাট লর্ড আরুউইন্ ব্রিটিশ সরকারের অনুমতিক্রমে ১৯২৯ সনের ৩১শে অক্টোবর এক ঘোষণা করেন যে, ঔপনিবেশিক স্বরাজই ভারতীয় শাসন-সংস্কারের উদ্দেশ্য। সাইমন্ কমিশনের শাসন-সংস্কার প্রস্তাবনা (Report) প্রকাশিত হইলে, সর্ববাদিসম্মত ভিত্তিতে ভারতশাসন সংস্কারের চেষ্টায় এক **গোলটেবিল বৈঠক** আহ্বানের উল্লেখও তাঁহার এই বিবৃতিতে ছিল।

১৯৩০ সালে সাইমন্ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ইহা মূলত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের জন্য সুপারিশ করে। অবশ্য, দেশীয় রাজ্য এবং ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশসমূহ লইয়া ভবিষ্যতে এক যুক্তরাষ্ট্র গঠনের আভাসও ইহাতে ছিল। ঐ বৎসরই প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন হয়। ব্রিটিশ সরকারের মনোনীত পার্লামেন্টের সর্বদল্ হইতে ১৩ জন প্রতিনিধি এবং ভারত হইতে ১৬ জন দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি ও ৫৭ জন ব্রিটিশ ভারতীয় প্রতিনিধি লইয়া তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ডের সভাপতিত্বে এই বৈঠক বসে। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্র গঠনই এই বৈঠকের কার্য হইবে, এমন কোন নিশ্চয়তা না থাকায় ভারতীয় রাষ্ট্র মহাসভা ইহা বর্জন করিয়া আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করে বৈঠকে প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, কিছুকালের জন্য নিরপত্তামূলক ক্ষমতা (safeguards) হাতে রাখিয়া ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন-সভার হাতে ভারতের শাসনভার

* এই কমিশনে কোন ভারতীয় সভ্য না থাকায়, ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ইহা বর্জন করেন।

প্রদত্ত হইবে। তিনি আরও বলেন যে, ভারতের পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন লাভে যাহাতে বিঘ্ন হইয়া না দাঁড়ায়, এমন ভাবেই এই ক্ষমতা ব্যবহৃত হইবে। ভারতের ঔপনিবেশিক স্বরাজলাভে এই স্বায়ত্ত-শাসন ক্ষমতারই যে অভাব রহিয়াছে, তাহাও তিনি স্বীকার করেন। এই বৈঠকে কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবেই দেশীয় রাজন্যবর্গ ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশগুলির সঙ্গে একত্র হইয়া এক **ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র** গঠনে স্বীকৃত হন। সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও অন্যান্য নানা বিষয়ের সমাধানের জন্য এই বৈঠক তখনকার মত স্থগিত থাকে।

গোলটেবিল বৈঠক (সেণ্ট্ জেম্‌স্ প্রাসাদ, লণ্ডন, ১৯৩০)

ভারতীয় রাষ্ট্র মহাসভার সহিত আপোষ করিয়া এক সর্বজনসম্মত যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে অতঃপর বড়লাট লর্ড আরুউইন্ মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে এক চুক্তি করেন। এই **গান্ধি-আরুউইন্ চুক্তিতে** বলা হয় যে, ব্রিটিশ সরকারের সম্মতি অনুযায়ী নির্ধারিত হইল যে, গোলটেবিল বৈঠকে পরিকল্পিত ভারত-শাসন-তন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা

হইবে ; যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তন এবং ভারতীয় স্বার্থে দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্বন্ধ, সংখ্যা লঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সমূহ, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও ঋণপরিশোধ সম্পর্কে বিহিত ব্যবস্থা সংরক্ষিত রাখিয়া ভারতবাসীদের শাসন দায়িত্ব প্রদান এই পরিকল্পনার অপরিহার্য অঙ্গ। এই আলোচনায় ভারত রাষ্ট্র মহাসভার প্রতিনিধিদের সহযোগিতার ব্যবস্থা অবশ্যই করা হইবে।

এই চুক্তি অনুসারে রাষ্ট্র-মহাসভার পক্ষ হইতে মহাত্মা গান্ধি ১৯৩১ সনের **দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক**-এ যোগদান করেন। কিন্তু তখনকার বিলাতী মন্ত্রিমণ্ডলে (National Government) রক্ষণশীল দলের প্রাধান্য থাকায়, ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব পরিবর্তিত হয়। কাজেই, মহাত্মা গান্ধিকে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের অমীমাংসিত বহু বিষয় সম্পর্কে অতঃপর ঘরোয়া আলোচনা এবং একাধিক কমিটিদ্বারা তদন্ত চলিতে থাকে। প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে রাজস্ব-বণ্টন, দেশীয় রাজ্যগুলির সহিত আর্থিক ব্যবস্থা এবং ভবিষ্যৎ নির্বাচক-মণ্ডলী ও ভোটদান-প্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে তদন্তই ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা লইয়া ভারত-শাসন-সংস্কারে এতদিন নানা গোলমাল চলিয়া আসিতেছিল। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে এই সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ডকে এক সিদ্ধান্ত দিতে প্রস্তাব করা হয়। তদনুসারে ১৯৩২ সালের আগস্ট মাসে **প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত** প্রকাশিত হইল। ইহা দ্বারা মুসলমান, শিখ, ভারতীয় খ্রীষ্টান, এ্যাংলো-ভারতীয় এবং ইউরোপীয় সম্প্রদায় প্রভৃতিকে আইন সভায় পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার দেওয়া হয়। হিন্দুদের

নির্যাতিত সম্প্রদায় * (Depressed Classes) এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মহিলাদের জন্যও ভিন্ন নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়। ইহা ছাড়া, জমিদার, ব্যবসায়ী-সমিতি, শ্রমিক-সমিতি, বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রভৃতির জন্য পূর্বের মতই ভিন্ন আসনের ব্যবস্থা হয়।

হিন্দুসমাজকে বর্ণহিন্দু ও নির্যাতিত হিন্দু এই দুই ভাগে বিভক্ত করিবার জন্য পৃথক্ নির্বাচনের ব্যবস্থায় মহাত্মা গান্ধি প্রতিবাদ করেন ও পরে অনশন করেন। ইহাতে হিন্দু ও নির্যাতিত হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ মিলিত হইয়া যারবেদা জেলে মহাত্মা গান্ধির অনশন-ভঙ্গের উদ্দেশ্যে **পুণাতে** এক **চুক্তি** করেন। এই চুক্তিতে স্থির হয় যে, নির্যাতিত সম্প্রদায়ের প্রতিটি সভ্যপদের জন্য ঐ সম্প্রদায়ের ভোটারগণ প্রথমে চারিজন সভ্য নির্বাচন করিবেন, এবং পরে **সমস্ত হিন্দু** ভোটার একত্র ভোট দিয়া এই চারিজনের মধ্য হইতে সেই সভ্যপদে একজনকে নির্বাচন করিবেন। এই চুক্তির ফলে তথাকথিত নির্যাতিত সম্প্রদায়ের সভ্য-সংখ্যা প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক নির্দিষ্ট সংখ্যা হইতে বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

ইহার পর ১৯৩২ সনে **তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক**-এ ভারত শাসন-সংস্কারের চূড়ান্ত আলোচনা হয়। ১৯৩৩ সালে ব্রিটিশ সরকার এই শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহাদের সুপারিশ প্রকাশ করিলেন; ইহাই **"হোয়াইট পেপার"** নামে পরিচিত। মূলত বর্তমান ভারত-শাসন আইনের অনুরূপ সংস্কারই হোয়াইট পেপারে প্রস্তাবিত হইয়াছিল।

এই পরিকল্পনা ও ভবিষ্যৎ ভারত-শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে বিবেচনার উদ্দেশ্যে ১৯৩৩ সালে পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদ হইতে ১৬ জন করিয়া

* "নির্যাতিত সম্প্রদায়" কথাটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হইলেও, রাজনৈতিক বিষয়ে যাহারা বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলী বলিয়া গণ্য সেই শ্রেণীর হিন্দুদের "তপশীলভুক্ত জাতি" (Scheduled Castes) আখ্যা হইয়াছে।

সভ্য লইয়া এক **জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারি কমিটি** গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো (Marquess of Linlithgow)। দেশীয় রাজ্যের ৭ জন, ব্রিটিশ ভারতের ২১ জন এবং ব্রহ্মদেশের ১২ জন প্রতিনিধি সহযোগী সভ্য (Assessor) হিসাবে এই কমিটিতে কার্য করেন। এই সহযোগী সভ্যদের কিন্তু ভোট দিবার বা পার্লামেণ্টের নিকট মন্তব্য দাখিল করিবার অধিকার ছিল না।

১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাসে এই **জয়েণ্ট কমিটির রিপোর্ট** প্রকাশিত হয়। ইহা হোয়াইট্‌ পেপারের প্রস্তাবগুলির যে সকল পরিবর্তন করে, তাহার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ; যথা—প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভার উভয় পরিষদেই ব্রিটিশ ভারতীয় আসনগুলির জন্য পরোক্ষ নির্বাচন (indirect election) হইবে ; অর্থাৎ প্রাদেশিক উর্ধ্ব ও নিম্ন পরিষদের সভ্যগণ (যেখানে উর্ধ্ব পরিষদ নাই, সেখানে কেবল এই উদ্দেশ্যেই অনুরূপ একটি সভা নির্বাচন করিতে হইবে) যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের উর্ধ্ব ও নিম্ন পরিষদের সভ্য নির্বাচন করিবেন। এই প্রস্তাব অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভার সভ্য নির্বাচনে ব্রিটিশ ভারতীয় সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীর ভোট দিবার অধিকার থাকিবে না। বাংলা, বিহার ও যুক্ত প্রদেশ ছাড়া বোম্বাই এবং মাদ্রাজেও আইন-সভার উর্ধ্ব ও নিম্ন দুইটি পরিষদ থাকিবে। পুলিস, বাণিজ্য-বৈষম্য এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সম্পর্কে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাসমূহ (safeguards) আরও কঠিনতর হইবে। ব্রিটিশ মন্ত্রী-সভার অনুমোদিত রাজাজ্ঞা-সমূহ (Orders-in-Council) পার্লামেণ্টেরও অনুমোদনসাপেক্ষ হইবে ; অর্থাৎ, ভবিষ্যতে ভারত-শাসন সম্পর্কিত সামান্য পরিবর্তন শুধু ব্রিটিশ মন্ত্রী-সভা নহে, পার্লামেণ্টের সম্মতির উপরেও নির্ভর করিবে। জয়েণ্ট কমিটির প্রস্তাব অনুসারেই ভারত-শাসন বিল প্রণীত হয় এবং পার্লামেণ্টের অনুমোদনে ১৯৩৫ সনে ভারত-

শাসন আইনে * পরিণত হয়। ইহার পর ভারত হইতে ব্রহ্মদেশ ও এডেনের বিচ্ছেদ, আর্থিক ব্যবস্থা এবং ভোট প্রভৃতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতে এক বৎসরের অধিক চলিয়া যায়। তাই ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে এই নূতন আইন অনুযায়ী প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্তিত হয়।

নূতন শাসন তন্ত্রের স্বরূপ—দেশ খুব বিশাল হইলে, একরাষ্ট্রীয় শাসনে নানা অসুবিধা দেখা দেয়। তাই উপযোগী ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তন করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। ইহা ছাড়া, বিভিন্ন প্রদেশসমূহের প্রাদেশিক অনুরাগ ও বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্যও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন প্রয়োজন হয়। অতি বিশাল দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ। এতকাল এদেশে কেন্দ্রীভূত শাসনে বহু অসুবিধা হইতেছিল। এই জন্যই শাসন একরাষ্ট্রীয় হইলেও, ১৯১৯ সালের আইনে কার্যত যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় প্রাদেশিক শাসনে স্বাতন্ত্র্য বিধানের চেষ্টা হইয়াছিল। অন্যদিকে স্বাধিকারসম্পন্ন দেশীয় রাজ্যসমূহ তাহাদের স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, এমন কোন শাসন ব্যবস্থায় ব্রিটিশ ভারতের সহিত যোগ দিতে সম্মত হয় নাই। এই সব কারণেই ভারতে যুক্তরাষ্ট্র † প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা সঙ্গত মনে হইয়াছে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য—পৃথিবীর সকল যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক সরকারের শাসন বিষয়গুলি নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়; এবং ইহাদের মধ্যে যে সরকারের ক্ষমতা উল্লেখ করা হয় না, অবশিষ্ট শাসন বিষয়সমূহ তাহার অধিকারেই ন্যস্ত হইয়া থাকে।

* পার্লামেন্টের ইতিহাসে এত বড় দীর্ঘ আইন আর হয় নাই। ইহাতে ৩২১টি ধারা এবং ১০টি তালিকা (Schedule) আছে।

† প্রাদেশিক সরকার ছাড়াও একরাষ্ট্রীয় শাসন চলিতে পারে এবং প্রাদেশিক সরকারের কার্য কেন্দ্রীয় সরকারই নিয়ন্ত্রণ করেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন কিন্তু প্রাদেশিক সরকার ব্যতীত সম্ভব হয় না এবং যুক্তরা সরকার প্রাদেশিক সরকারের কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কিন্তু কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক উভয় সরকারের শাসন ক্ষমতাই যথাসম্ভব সুনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য, ব্রিটিশ ভারতের তুলনায় দেশীয় রাজ্যসমূহকে অত্যধিক ক্ষমতা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। অবশ্য, অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের মত এই যুক্তরাষ্ট্রেও কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে শাসনবিষয় সম্পর্কে মতবিরোধ হইলে, উহার মীমাংসা করিবার জন্য তৃতীয় পক্ষ হিসাবে এক যুক্তরাষ্ট্রীয় কোর্টের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। সাধারণত সকল যুক্তরাষ্ট্রেই উহাদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকে। কিন্তু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে দেশীয় রাজ্য ও ব্রিটিশ প্রদেশরূপ অংশসমূহের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রাখা হইয়াছে। দেশীয় রাজ্যগুলি প্রদেশসমূহের মত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসিত নহে; রাজাদের চিরাচরিত অল্পাধিক স্বেচ্ছাচারমূলক শাসনই সেখানে বজায় থাকিবে। আবার, যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিলেও দেশীয় রাজ্যসমূহ তাহাদের শাসন সম্পর্কিত কেবল অল্প কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয় যুক্তরাষ্ট্রের হাতে অর্পণ করিবে।

পৃথিবীর সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রেই সামরিক ও বৈদেশিক বিষয়াধিকাররূপ সমগ্র জাতীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারেই থাকে, কিন্তু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে উহার চূড়ান্ত ক্ষমতা গভর্নর জেনারেলের হাতে রাখা হইয়াছে। আবার, প্রয়োজন মত, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় সকল কার্যেই গভর্নর ও গভর্নর জেনারেলের শেষ হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা রহিয়াছে; এবং তাঁহারা দায়ী পার্লামেন্টের নিকট। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের মত এই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-তন্ত্র পরিবর্তনের ক্ষমতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবেও যুক্তরাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত হয় নাই— সে ক্ষমতা পার্লামেন্টের হাতেই রহিয়াছে। কাজেই গঠনের দিক হইতে ইহাকে যুক্তরাষ্ট্র বলা গেলেও, ক্ষমতার দিক দিয়া ইহা যুক্তরাষ্ট্র নহে;

এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে, ইহা পার্লামেণ্টের শাসনাধীনে স্বায়ত্ত-শাসনের একটি অভিব্যক্তি মাত্র।

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে আসন-বণ্টন, দেশীয় রাজ্য হইতে জনসাধারণের পরিবর্তে রাজন্যবর্গ কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভায় প্রতিনিধি মনোনয়ন এবং কেন্দ্রীয় নিম্ন পরিষদের পরোক্ষ নির্বাচনও এই শাসন-তন্ত্রের আর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য।

যদিও **ঔপনিবেশিক স্বরাজ**-এর জন্য আন্দোলনের ফলেই এই শাসন-তন্ত্রের পরিকল্পনা, তথাপি ঔপনিবেশিক স্বরাজের কথা এই আইনে স্থান পায় নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই আইনের ভূমিকা হিসাবে চিরাচরিত প্রথামত উদ্দেশ্যজ্ঞাপক কোন প্রস্তাবনাই (Preamble) সংযোজিত হয় নাই। পার্লামেণ্টে সরকার পক্ষ হইতে এইমাত্র বলা হইয়াছে যে ১৯১৯ সনের আইনের প্রস্তাবনাই এই নূতন আইন সম্বন্ধেও প্রযোজ্য হইবে। সেই প্রস্তাবনায় কিন্তু ঔপনিবেশিক স্বরাজলাভের কথা নাই, আছে ক্রমিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভের কথা। ইহা ছাড়া, উপরিউক্ত প্রস্তাবনা ব্রিটিশ ভারত সম্বন্ধেই প্রযোজ্য হইয়াছিল ; বর্তমানের দেশীয় রাজ্য সমন্বিত যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে উহা তেমনভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে না। অবশ্য, এই আইনে ঔপনিবেশিক স্বরাজের উল্লেখ না থাকিলেও, অন্যত্র ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বরাজের আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে।

গভর্নর জেনারেলের প্রতি **রাজার উপদেশ লিপিতে** (Instrument of Instruction) গভর্নর জেনারেলকে তাঁহার উপর অর্পিত কর্তব্য এমন ভাবে পালন করিতে বলা হইয়াছে, যেন কালে ভারতবর্ষ ঔপনিবেশিক স্বরাজ লাভ করিতে পারে। বলা বাহুল্য, এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে, গভর্নর জেনারেল প্রভৃতির অতিরিক্ত ক্ষমতা আইন-সভার মতের বিরুদ্ধে প্রয়োগ না করিবার রীতি সংস্থাপন করা প্রয়োজন। ১৮৬৭ সনের আইন অনুসারে ক্যানাডার উপর

ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের যথেষ্ট কর্তৃত্ব থাকিলেও উহার প্রয়োগ না হইবার ফলে ক্যানাডা যেমন ঔপনিবেশিক স্বরাজ লাভ করিয়াছে, ভারতেও তেমন ব্যবস্থা হইতে পারে। এই আইনে মন্ত্রীসভা অনুমোদিত রাজাজ্ঞা (Orders-in-Council) প্রদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে ; তাহা দ্বারাও ক্রমে ক্রমে ক্ষমতা ছাড়িয়া দিয়া ইংরেজ সরকার ভারতবাসীর শাসন-কর্তৃত্ব অনেক পরিমাণে বাড়াইয়া দিতে পারেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সম্রাট্ ও ভারত-সচিব

"প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন ব্যর্থ হয় নাই। যে অদৃশ্য লিপিকর সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ইতিহাস রচিয়া চলিয়াছেন, তিনি ত' নিশ্চিন্তে বসিয়া নাই। যাঁহাদের বিচার-বুদ্ধি এবং অন্তর্দৃষ্টি রহিয়াছে, তাঁহারা বলিবেন যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের লক্ষ্য একই, পন্থাও এক।" *

স্যর্ (পরে লর্ড) সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (বোম্বাই কংগ্রেসে সভাপতির অভিভাষণ, ১৯১৫)।

সম্রাট্ ও ভারত-শাসন—ব্রিটেনের অধীশ্বর ও ভারতের সম্রাট্ ভারত শাসনে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন ; আইনত, তিনিই ভারতের মূল শাসক। ১৯৩৫ সনের ভারত-শাসন আইন

* "The East and the West have met not in vain. The invisible Scribe, who has been writing the most marvellous history, that has ever been written, has not been idle. Those, who have the discernment and the inner vision to see, will note that there is only one goal, there is only one path."

ভারত সম্রাট্ ও সাম্রাজ্ঞী ইণ্ডিয়া অফিস হইতে বাহির হইতেছেন

(নভেম্বর ১৯৩৯)

কার্যকরী হওয়া পর্যন্ত, রাজার পক্ষ হইতে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও ভারত-সচিব (Secretary of State for India) ব্রিটিশ ভারতের মূল শাসন পরিচালিত করিতেছিলেন। ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল সম্রাটেরই প্রতিনিধি হিসাবে ভারত-সচিবের সাধারণ কর্তৃত্বাধীনে ভারত শাসন করিতেছিলেন। ভারতীয় করদ এবং মিত্র রাজ্য-সমূহের চরম রাজ-কর্তৃত্বও ব্রিটিশ সম্রাটের হাতেই ন্যস্ত ছিল। কিন্তু বর্তমান ভারত-শাসন আইনে পার্লামেন্ট, ভারত-সচিব, গভর্নর জেনারেল এবং গভর্নর প্রভৃতির পূর্বোক্ত শাসন ক্ষমতার পরিবর্তন করা হইয়াছে। সম্রাট উহাদের যে শাসন-ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা পুনরায় নিজ হাতেই গ্রহণ করিয়াছেন। নূতন শাসন-তন্ত্রে তিনি সেই ক্ষমতা আবার পার্লামেন্ট, ভারত-সচিব এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছেন। সম্রাটের নানাবিধ "বিশিষ্ট অধিকার" সমূহ (Royal prerogatives) কিন্তু ইহাতে অক্ষুণ্ণই থাকিবে ; বৈদেশিক সম্পর্ক, যুদ্ধ ও সন্ধিবিগ্রহ, রাজ্যাংশ হস্তান্তর, ক্ষমা-প্রদর্শন প্রভৃতি রাষ্ট্র-অধিকার বর্তমান আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনে অবশ্য ভারতের আভ্যন্তরীণ বহু বিষয়ে তাঁহার কর্তৃত্বের প্রয়োজন ও অধিকার করিয়া যাইবে।

ভারত-সচিবের কর্তৃত্ব—নূতন শাসনতন্ত্রে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের হাতে বিশিষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ঐ সব বিষয়ে পার্লামেণ্ট ও ভারত-সচিবের পূর্ব ক্ষমতা তাই অনেকখানি সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। পার্লামেণ্টের পক্ষ হইতে ভারত-শাসনের নানা জটিল বিষয়ে ভারত-সচিবের ক্ষমতা কমিয়া গেলেও, সাধারণভাবে, বিশেষ করিয়া কয়েকটি বিষয়ে, তাঁহার পরিচালন-কর্তৃত্ব বজায় রাখা হইয়াছে।

নূতন আইনে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রে দ্বৈতশাসনের ব্যবস্থা করা

হইয়াছে। তাই, সামরিক (Defence), বৈদেশিক (External affairs) ও যাজক (Ecclesiastical) বিভাগগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভার কর্তৃত্বাধীনে রাখা হয় নাই। এই সংরক্ষিত বিষয়সমূহ রহিয়াছে স-পার্লামেণ্ট সম্রাটের হাতে। স-পার্লামেণ্ট সম্রাটের এই সকল বিষয় সম্বন্ধীয় ক্ষমতা গভর্নর জেনারেল পরিচালনা করিলেও, ভারত-সচিব তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন। নূতন শাসন-তন্ত্রে তাই ভারত সচিব এক বিশিষ্ট মর্যাদা লাভ করিয়াছেন।

ভারত-সচিবের ক্ষমতার ক্রম-বিবর্তন—বর্তমান আইনের পূর্ব পর্যন্ত ভারত-শাসন মূলত ভারত-সচিবের হাতেই ছিল, বলা যায়। ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারত-শাসন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ সমিতির (Board of Control) সভাপতির হাতে অর্পিত হয়। ১৮৫৮ সনে ব্রিটিশ রাজ-শক্তি ভারত-শাসন-ভার সাক্ষাৎ ভাবে গ্রহণ করিলে পর, নিয়ন্ত্রণ সমিতির এই ক্ষমতা একজন নব-নিযুক্ত ব্রিটিশ মন্ত্রীর (ভারত-সচিব) হাতে ন্যস্ত হয়। এই ভারত-সচিবকে তাঁহার কার্যে সাহায্য করিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ইণ্ডিয়া কাউন্সিল নামে এক পরামর্শ-সভাও সৃষ্ট হয়। ইংল্যাণ্ডে ভারত সরকারকে "হোম-চার্জ" (ব্রিটিশ কর্মচারিদের পেন্সন এবং ভারত-সরকারের সামরিক ও অসামরিক প্রয়োজনের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির ব্যয়, প্রভৃতি) বাবদ বাৎসরিক যে টাকা দিতে হয়, ভারত-সচিবকে তাহার যথাবিহিত ব্যবস্থার ভার দেওয়া হয়।

ভারত-সরকার এই ভারত-সচিবের কর্তৃত্বাধীনে কার্য করেন। ভারতের কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার আইন প্রণয়ন ও পরিবর্তনের পূর্বে ভারত-সচিবের সম্মতি প্রয়োজন হইত। ইহা ছাড়া, ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন-সভা কর্তৃক গৃহীত হইবার পরেও, ভারত-সচিবের পরামর্শমত সম্রাট্ যে কোন আইন বাতিল করিতে পারিতেন। গভর্নর জেনারেলকে সর্বদা ভারত-সচিবের আদেশ অনুসারে

কার্য করিতে হইত। আবার, ভারত-সচিবের পরামর্শমতই সম্রাট্ গভর্নর জেনারেল ব্যতীত প্রাদেশিক গভর্নর প্রভৃতি প্রধান প্রধান কর্মচারিদের নিয়োগ করিতেন। আই. সি. এস্., আই. এম্. এস্. প্রভৃতি নিখিল-ভারতীয়-কর্মচারি ভারত-সচিবই নিযুক্ত করিতেন। ভারতের কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়ে তাঁহার মতামত চূড়ান্ত হইত। ভারত-শাসন আইনের নানা উপবিধিও তিনিই করিয়া দিতেন।

১৯১৯ সনের আইনে ভারত-সচিবের ক্ষমতা প্রভৃতির কিছু পরিবর্তন ঘটে। ব্রিটিশ সরকারের মন্ত্রী হইলেও, ১৯১৯ সনের আইনের পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার বেতনাদি ভারত-সরকারকেই দিতে হইত। কিন্তু অতঃপর তাঁহার বেতন (বৎসরে ৫.০০০ পাউণ্ড) ও তাঁহার পার্লামেণ্টারী অধস্তন সেক্রেটারীর বেতন (বৎসরে ১,৫০০ পাউণ্ড) এবং ইণ্ডিয়া অফিসের খরচের প্রায় অর্ধেক ব্রিটিশ সরকার হইতে দেওয়ার বিধান হয়। তখন এই ব্যবস্থাও হয় যে, গভর্নর জেনারেল ও ভারতীয় আইন-সভা কোন রাজস্ব বিষয়ে একমত হইলে, সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষার্ কারণ ব্যতীত, ব্রিটিশ সরকার তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। ১৯২১ সনে নব-নিযুক্ত **ভারতীয় হাই কমিশনার**-এর হাতে ভারত সরকারের জন্য দ্রব্য-সম্ভার ক্রয় ও ব্যবস্থার ভার এবং ভারতীয় ছাত্রদের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি ন্যস্ত হওয়ায়, ভারত-সচিবের তৎসম্বন্ধীয় কার্যভার লাঘব হয়।

ইণ্ডিয়া কাউন্সিল—১৮৫৮ সালে, ভারত-সচিবের কার্যে সাহায্য করিবার জন্য ইণ্ডিয়া কাউন্সিল নামে এক সভার সৃষ্টি হয়। ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে অভিজ্ঞ কতিপয় ব্যক্তিকে উহার সভ্য রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। ভারত-সচিব এই কাউন্সিলের সভাপতি হ'ন। এই সমিতির সরকারী সভাপতিকে নিযুক্ত এবং পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা

ভারত-সচিবকে দেওয়া হয়। পূর্বে ১৫ জন সভ্য * লইয়া এই সমিতি গঠিত হইত। কিন্তু ১৯১৯ সনের আইন অনুসারে ভারত-সচিবের ইচ্ছামত ৮ হইতে ১২ জন সভ্য দ্বারা ইহা গঠিত হইতে পারিত।

সভাগণ ভারত-সচিব কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন এবং এই সমিতিতে সভ্য থাকাকালীন পার্লামেন্টের সভ্য হইতে পারিতেন না। কেন না নিরপেক্ষভাবে শাসনকার্যে সাহায্য করাই ছিল ইহাদের কর্তব্য। ১৯১৯ সনের আইনে ইহাদের কার্যকাল ৭ বৎসর হইতে কমাইয়া ৫ বৎসর করা হয়। পার্লামেন্টের উভয় সভা প্রস্তাব করিলে ইহার পূর্বেও ইহাদের পদচ্যুত করিতে পারিতেন।

ভারত-সচিবকে পরামর্শ দেওয়া ছাড়া, কয়েকটি বিষয়ে এই সমিতির বিশিষ্ট অধিকারও ছিল। ভারতীয় রাজস্ব বা সম্পত্তি গ্রহণ, ঋণ, চুক্তি, মামলা, কতিপয় সামরিক কর্মচারির পদচ্যুতি এবং ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের নিয়ম প্রণয়ন ও উহাতে লোক নিয়োগ প্রভৃতি ব্যাপারে সাধারণতঃ ভারত-সচিব ইহার অধিকাংশ সভ্যের মতামত অনুযায়ী কার্য করিতে বাধ্য ছিলেন। ভারতের সরকারি হিসাব পরীক্ষক (Auditor General) স-কাউন্সিল ভারত-সচিব কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন। অন্যান্য বিষয়ে ইঁহারা ভারত-সচিবকে মাত্র পরামর্শ দিতে পারিতেন। প্রতি মাসেই এই সমিতির একটি অধিবেশন হওয়ার নিয়ম ছিল।

ভারত-সচিবের দুই জন সহকারী সেক্রেটারি ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন স্থায়ী সরকারি কর্মচারি এবং অপর জন পার্লামেন্টের সদস্যদিগের ভিতর হইতে মন্ত্রীদের মত নির্বাচিত হইতেন। এই স্থায়ী

* এই সমিতিতে নিয়োগের ঊর্ধ্বপক্ষে ৫ বৎসর পূর্বে ভারতে অন্তত ১০ বৎসর বাস করিয়াছেন, এমন লোক হইতে ইহার অর্ধেক সভ্য নিযুক্ত করিতে হইত। প্রতি সভ্য বৎসরে ১,২০০ পাউণ্ড বেতন পাইতেন; ভারতীয় সদস্য ৩ জন প্রত্যেকে অতিরিক্ত ৬০০ পাউণ্ড ভাতা পাইতেন।

সহকারী ভারত-সচিব পার্লামেণ্ট ও মন্ত্রিমণ্ডল পরিবর্তিত হইলেও, স্থায়ী ভাবে অফিসের কার্য করিয়া যান। কিন্তু অপর সহকারী ভারত-সচিব মন্ত্রিমণ্ডলের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারত-সচিবের মতই পরিবর্তিত হইয়া থাকেন। * সাধারণত, ভারত-সচিব যে সভার সভ্য নহেন, পার্লামেণ্টিয় সহকারী ভারত-সচিব পার্লামেণ্টের সেই সভার সভ্য হন এবং তথায় সরকারপক্ষের অভিমত ব্যক্ত করেন।

কার্যত ভারত-শাসনের মূল নীতি ভারত-সচিব নিয়ন্ত্রণ করিতেন সত্য কিন্তু তিনি এই কার্য স্বেচ্ছামত করিতেন বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। সমস্ত কার্যের জন্যই তিনি পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী থাকিতেন। তিনি একাধারে পার্লামেণ্ট, ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা ও প্রিভি-কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন। পার্লামেণ্টের পক্ষ হইতে তিনি পার্লামেণ্টের ভারত-শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন। তাঁহাকে প্রতি বৎসরই বিগত সনে ভারত-শাসনের আয়ব্যয়ের হিসাব এবং ভারতের নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতির বিবরণ Report) পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করিতে হইত। পার্লামেণ্টে আবার তাঁহাকে ভারত-শাসন সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্নও করা হইত।

ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ এবং তাহাদের প্রতিনিধি হিসাবে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টই ভারতের শাসনকর্তা। তাই ভারত-শাসনে পার্লামেণ্টের চরম কর্তৃত্বের ব্যবস্থা।

বর্তমান ব্যবস্থা—বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে যে সব বিষয়ে নিদিষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, সে সমস্ত ব্যাপারে স্বভাবতই ভারত-সচিবের এখন আর প্রত্যক্ষ ক্ষমতা থাকিবে না। প্রাদেশিক গভর্নর ও গভর্নর-জেনারেল যে সব বিষয়ে পার্লামেণ্টের

* লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ লর্ড সভায় এই পার্লামেণ্টিয় সহকারী ভারত-সচিবের কার্য করিয়াছিলেন।

নিকট দায়ী থাকিবেন এখন হইতে মাত্র সেই সম্বন্ধেই ভারত-সচিবের কর্তৃত্ব থাকিবে। বর্তমান ব্যবস্থায় সামরিক ও বৈদেশিক বিষয়ে গভর্নর জেনারেলের বিশিষ্ট ক্ষমতা থাকিবে, কিন্তু যথেচ্ছভাবে তিনি ঐ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন না। ঐ সকল বিষয়ে তিনি পার্লামেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে থাকিবেন এবং পার্লামেণ্টের পক্ষ হইতে ভারত-সচিব তাঁহাকে ঐ বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ করিবেন। প্রাদেশিক গভর্নর নিজ বিবেচনামত যে কার্য করিবেন তাহাতে গভর্নর জেনারেলের নিজ বিবেচনামূলক সম্মতি প্রয়োজন হইবে এবং গভর্নর জেনারেল আবার প্রাদেশিক বা যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয়ে নিজ বিবেচনামত যে কার্য করিবেন তাহাতে ভারত-সচিবের সম্মতির প্রয়োজন হইবে।* এইভাবে গভর্নর ও গভর্নর জেনারেল ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধি বা বিবেচনামত কার্য করিলে ভারত-সচিবের অনুমোদন প্রয়োজন হইবে।

ক্রু কমিটি †, হোয়াইট্ পেপার এবং জয়েণ্ট কমিটি ভারত-সরকার ও ভারত-সচিবের মধ্যবর্তী ইণ্ডিয়া কাউন্সিল নিষ্প্রয়োজন মনে করায়, বর্তমান আইনে ইণ্ডিয়া কাউন্সিল উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ভারত-সচিবকে সরকারি কর্মচারি নিয়োগ, আর্থিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকের প্রয়োজন। তাই ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের স্থলে মুখ্যত কয়েকজন পুরাতন সরকারি কর্মচারিকে **ভারত-সচিবের পরামর্শদাতা**-রূপে নিযুক্ত করার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে ভারত-সচিব তিন হইতে ছয়জন পর্যন্ত নিজ পরামর্শদাতা নিযুক্ত করিতে পারিবেন। ‡

---

* তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

† Crew Committee on the Home Administration of Indian Affairs, 1919.

‡ দশ বৎসর ভারতে সরকারি কার্য করিয়াছেন এবং ঊর্ধ্ব পক্ষে দুই

এই আইন অনুসারে **নিখিল ভারতীয় কর্মচারি** নিয়োগ বিষয়ক উপবিধান প্রণয়নে ও ভারত সরকারের রাজনৈতিক বিভাগীয় কর্মচারি সম্বন্ধে বিধিব্যবস্থা করায় ভারত-সচিবকে নিজ পরামর্শদাতাদের মতামত অবশ্যই লইতে হইবে। এই সব বিষয়ে ভারত-সচিবকে সভায় উপস্থিত সভ্যদের অন্তত অর্ধেকের মতানুযায়ী কার্য করিতে হইবে। অন্য সব বিষয়ে পরামর্শদাতাদের মত লওয়া বা না লওয়া ভারত-সচিবের ইচ্ছাধীন।

ভারত-সচিব এবং তাঁহার এই পরামর্শদাতা ও কর্মচারিবৃন্দের বেতনাদি ব্রিটিশ সরকারই বহন করিবে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে ভারত-সচিবের দপ্তর যে সকল কার্য করিবে, তাহার জন্য ভারত সরকার ব্রিটিশ সরকারকে, গভর্নর জেনারেল ও ব্রিটিশ অর্থ-বিভাগের নির্ধারণমত অর্থ প্রদান করিবে। এই আইনের পূর্বে স-কাউন্সিল ভারত-সচিবের বা তাঁহার অডিটরের অধীনে যে সব কর্মচারি ছিল তাঁহাদের ভাতা ও পেন্‌শনাদিও ভারত সরকারের তহবিল হইতে দেওয়া হইবে।

নূতন ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে চুক্তি স-কাউন্সিল ভারত-সচিবের পরিবর্তে গভর্নর জেনারেল বা প্রাদেশিক গভর্নরই সম্পাদন করিবেন।

বর্তমান আইনে ভারতীয় **হাই-কমিশনারের** কার্যাবলীর বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই।

উপরিউক্ত ব্যবস্থাসমূহ দ্বারা ভারতীয় শাসনের উপর ভারত-সচিবের

বৎসরের পূর্বে ভারত ত্যাগ করেন নাই, এমন ব্যক্তি হইতে উপরিউক্ত পরামর্শদাতাদের অর্ধেক সংখ্যক নিযুক্ত হইবেন। এই পরামর্শদাতাদের কার্যকাল পাঁচ বৎসর এবং এই কার্যকালে ইহারা পার্লামেণ্টের সভ্য হইতে পারিবেন না। ইহারা বৎসরে ১৩৫০ পাউণ্ড বেতন পাইবেন এবং ভারতবাসী হইলে বৎসরে ছয়শত পাউণ্ড অতিরিক্ত ভাতা পাইবেন।

কর্তৃত্ব অবশ্য অনেকাংশেই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ভারতবর্ষ পূর্ণ ঔপনিবেশিক স্বরাজের পথে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারত-সচিবের এই কর্তৃত্ব ক্রমে ভারত-সরকারের হস্তেই ন্যস্ত করার প্রয়োজন হইবে। *

* এই সম্পর্কে মনে রাখিতে হইবে, যতদিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত না হয়, ততদিন ভারত-সচিব ও তাঁহার পরামর্শদাতাগণ সম্পর্কে ব্যবস্থা পূর্ণভাবে কার্যকরী হইবে না। ঐ পর্যন্ত পূর্বের অনুরূপ সংখ্যক সভ্য থাকিবে। তবে কার্যত নিখিল ভারতীয় চাকুরি সম্পর্কেই উঁহাদের মতামত লইতে ভারত-সচিব বাধ্য থাকিবেন। যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ভারত-সচিবের কেন্দ্রীয় ভারত-সরকারের উপর ১৯১৯ সনের আইনের ব্যবস্থা মত, কর্তৃত্ব থাকিবে; প্রাদেশিক শাসনে অবশ্য তাঁহার হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা কমিয়া যাইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

"সমস্ত বৈচিত্র্য ও বিরোধকে একটা বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে বাঁধিয়া তোলাই আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় শিক্ষা। এই শিক্ষা যদি আমাদের অসম্পূর্ণ থাকে, তবে স্বায়ত্ত-শাসন আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে। যথার্থ স্বায়ত্ত-শাসনের অধীনে মত বৈচিত্র্য দলিত হয় না, সকল মতই আপনার যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া লয় এবং বিরোধের বেগে পরস্পরের শক্তিকে পরিপূর্ণরূপে সচেতন করিয়া রাখে।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীতে অভিভাষণ, ১৩১৪)।

১৯৩৫ সনের আইনে ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হইয়াছে। বৃটিশ ভারতীয় প্রদেশসমূহ এবং যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানেচ্ছু দেশীয় রাজ্য লইয়া এই যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে। অবশ্য, এই যুক্তরাষ্ট্র কবে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা আজিও স্থির হয় নাই। তবে, যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্তিত হইয়া গিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্ম-বিভাগ—ভারতের শাসন বিষয়গুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারসমূহের মধ্যে নির্দিষ্টরূপে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মাত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-বিষয় সম্বন্ধেই যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্ম-বিভাগের (Federal Executive) অধিকার থাকিবে। ইহা ছাড়া, ভারত-সম্রাটের পক্ষ হইতে জল, স্থল এবং বিমান-বাহিনী সংগঠন ও পরিচালনার ভারও এক যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্ম-বিভাগের

হাতেই থাকিবে।* আদিম জাতিসমূহ-অধ্যুষিত অঞ্চল (Tribal Areas) সম্বন্ধেও যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্ম-বিভাগের ক্ষমতা রহিয়াছে।

এক যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্ম-বিভাগ একজন **গভর্নর-জেনারেল** এবং তাঁহার **মন্ত্রি-সভা** (Council of Ministers) ও কয়েকজন **পরামর্শ দাতা** (Counsellors) লইয়া গঠিত হইবে।

গভর্নর-জেনারেল—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মূল কর্তৃত্ব সম্রাটের। তাঁহার পক্ষ হইতে এক যুক্তরাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সম্রাট্ একজন গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু যে সকল দেশীয় রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিবে না, তাহাদের উপরে সম্রাটের যে ক্ষমতা রহিয়াছে, তাহা পরিচালনা করিবেন **সম্রাটের প্রতিনিধি** (His Majesty's Representative)। আবার, যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিয়াও, দেশীয় নরপতিগণ যুক্তরাষ্ট্র প্রবেশ-লিপির (Instrument of Accession) সর্ত অনুসারে যে সকল বিষয় নিজেদের শাসনাধীনে রাখিবেন, সে সকল সম্বন্ধেও এই রাজপ্রতিনিধিই সম্রাটের ক্ষমতা পরিচালনা করিবেন। অবশ্য, এই গভর্নর জেনারেল ও রাজপ্রতিনিধি একই ব্যক্তি হইতে পারিবেন; বর্তমান ব্যবস্থাও তাহাই। গভর্নর জেনারেল সাধারণত ৫ বৎসরের জন্য সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় তহবিল হইতে তিনি ভাতা প্রভৃতি ছাড়া বাৎসরিক ২,৫০,৮০০ টাকা বেতন পাইবেন।†

গভর্নর জেনারেলের সংরক্ষিত বিষয় ও পরামর্শ-দাতা—স্বাধীন গণতন্ত্রে কর্ম-বিভাগ দেশের প্রতিনিধি গঠিত আইন-

* কিন্তু কেন্দ্রীয় আইন-সভার অধিকারভুক্ত অথবা করদ ও মিত্র রাজ্য কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভার অধিকারে প্রত্যর্পিত বিষয় ভিন্ন অপরাপর বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্ম-বিভাগের কোন ক্ষমতা থাকিবে না।

† ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্নর জেনারেলের বেতন বৎসরে ১০ হাজার পাউণ্ড (সাধারণত ১ পাউণ্ড=১৩⅓ টাকা) মাত্র।

সভার অধীনেই থাকে। কিন্তু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে গভর্নর জেনারেল (১) দেশরক্ষা (Defence), (২) যাজকীয় ব্যাপার (Ecclesiastical Affairs), (৩) বৈদেশিক সম্পর্ক (Foreign Affairs) এবং (৪) আদিম জাতিদের বসতি (Tribal Areas) সম্বন্ধে নিজ বিবেচনামত (in his discretion) ব্যবস্থা করিবেন। এইগুলি তাঁহার হাতে ন্যস্ত বিষয়। গভর্নর জেনারেল তাঁহার হাতে ন্যস্ত বিষয় সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভা বা মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ না লইয়াই কার্য করিবেন। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অন্যদেশের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক বিষয়ে গভর্নর জেনারেল নিজ মন্ত্রী ও আইন-সভার মতামত অনুসারে কার্য করিবেন।

এই সকল সংরক্ষিত বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য গভর্নর জেনারেল অনধিক তিনজন **পরামর্শদাতা** (Counsellors) নিয়োগ করিতে পারিবেন। ইঁহাদের দায়িত্ব থাকিবে গভর্নর জেনারেলের কাছে, কিন্তু ইঁহাদের বেতন ও চাকুরির নিয়ম প্রভৃতি স-কাউন্সিল সম্রাট্ সাব্যস্ত করিয়া দিবেন। ইহাদের উপর যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভার কোন কর্তৃত্ব থাকিবে না।

উপরিউক্ত সংরক্ষিত বিষয় * সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভায় গভর্নর জেনারেলের মতামত প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে এই পরামর্শদাতাগণ

* গভর্নর জেনারেলের নিজ বিবেচনাধীন উপরিউক্ত বিষয় সম্বন্ধে রাজোপদেশ লিপিতে (Instrument of Instructions) বলা হইয়াছে যে, বহির্বাণিজ্য সম্পর্কিত ব্যাপারসমূহ বৈদেশিক বিষয়ের অন্তর্গত হইলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ইংল্যাণ্ড এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য-চুক্তি করিতে পারিবে ;

এবং, দেশরক্ষা সংরক্ষিত বিষয় হইলেও, দেশরক্ষার জন্য কত টাকা কি ভাবে ব্যয় করা হইবে, তাহা গভর্নর জেনারেল, যথাসম্ভব যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থসচিবের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিবেন। ইহা ছাড়া, দেশ রক্ষার আনুমানিক ব্যয় আইন-সভার সম্মুখে উপস্থাপিত করার পূর্বে

আইন-সভায় বক্তৃতা দিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহাদের ভোট দিবার অধিকার থাকিবে না।

মন্ত্রি-সভা (Council of Ministers)—উল্লিখিত সংরক্ষিত বিষয়সমূহ * ব্যতীত, অন্যান্য কতকগুলি বিষয় আবার গভর্নর জেনারেলকে তাঁহার **ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি অনুসারে** (in his individual judgment) বা **নিজ বিবেচনামত** (in his discretion) কার্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। † এই সকল বিষয় ভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-কার্যে গভর্নর জেনারেলকে পরামর্শদান ও সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার একটি মন্ত্রি-সভা থাকিবে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলীর, বিশেষ করিয়া অর্থ সচিবের সঙ্গে পরামর্শ করিতে হইবে।

রাজোপদেশ লিপিতে ইহাও বলা হইয়াছে যে দেশরক্ষা সম্পর্কে গভর্নর জেনারেল তাঁহার মন্ত্রী, পরামর্শদাতা ও নিজের মধ্যে সম্মিলিত আলোচনা উৎসাহিত করিবেন, এবং সম্রাটের ভারতীয় সৈন্যদলে ভারতীয় উচ্চ কর্মচারি নিয়োগ বা ঐ সৈন্য ভারতের বাহিরে প্রেরণ সম্বন্ধে বিবেচনা করার সময় মন্ত্রীদের মতামত গ্রহণ করিবেন।

* যে সকল বিষয় গভর্নর জেনারেল মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে পরিচালনা করিবেন. সেইগুলিকে হস্তান্তরিত বিভাগ এবং যে বিষয়গুলি তিনি পরামর্শদাতাদের সাহায্যে পরিচালনা করেন, সেইগুলিকে সংরক্ষিত বিভাগ বলা যায়। এইভাবে প্রদেশিক দ্বৈতশাসন কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

† গভর্নর জেনারেল যখন "ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি অনুসারে" কার্য করিবেন, তখন মন্ত্রীদের সঙ্গে কোন বিষয়ে একমত হইতে না পারিলে, তিনি যাহা সঙ্গত মনে করেন, তাহাই করিবেন। কিন্তু "নিজ বিবেচনামত" কার্য করিবার কালে মন্ত্রীদের মতামত জানিবারও তাঁহার কোন প্রয়োজন হইবে না ; অর্থাৎ মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ করা এবং তদনুসারে কার্য করা গভর্নর জেনারেলের সম্পূর্ণ নিজ বিবেচনাধীন,

মন্ত্রিগণ সংখ্যায় ১০ জনের বেশি হইবেন না। গভর্নর জেনারেলই তাঁহার এই মন্ত্রি-মণ্ডলী নিযুক্ত, এবং প্রয়োজন হইলে, পদচ্যুত করিবেন। এই সম্বন্ধে রাজোপদেশ লিপিতে বলা হইয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভার বিশ্বাসভাজন হইতে পারিবেন, এমন লোককেই তিনি মন্ত্রী নিযুক্ত করিবেন। অবশ্য, দেশীয় রাজ্যের ও সংখ্যাল্প-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-দিগকে যথাসম্ভব মন্ত্রিমণ্ডলে লইতে চেষ্টা করিতে হইবে। গভর্নর-জেনারেল তাঁহার নিজ বিবেচনামত মন্ত্রিমণ্ডলের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন। *

গভর্নর জেনারেল আইন-সভার বাহিরের লোককেও মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে পারিবেন। কিন্তু এই ভাবে যিনি মন্ত্রী নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাকে অন্তত ছয় মাসের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভার যে কোন পরিষদের সভ্য হইতে হইবে। মন্ত্রীদের বেতন গভর্নর জেনারেলই স্থির করিবেন। মন্ত্রিমণ্ডলী গভর্নর জেনারেল এবং আইন-সভা উভয়ের নিকটই দায়ী হইবেন।

মন্ত্রিগণ গভর্নর জেনারেলকে যে উপদেশ দিবেন, তাহা আদালতের বিচার্য হইবে না। কিন্তু গভর্নর জেনারেল মন্ত্রি-সভা সম্পর্কে বে-আইনী এ সম্পর্কে মন্ত্রীদের কোন অধিকারই থাকিবে না। কোন্ বিষয়ে তাঁহাকে "ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধি অনুসারে" এবং কোন্ বিষয়ে "নিজ বিবেচনামত" কার্য করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহাও গভর্নর জেনারেলই "নিজ বিবেচনামত" স্থির করিবেন।

প্রাদেশিক গভর্নরদেরও প্রাদেশিক ক্ষেত্রে অনুরূপ অধিকার রহিয়াছে।

* বিলাতের রাজা কিন্তু এখন আর নিজ মন্ত্রি-সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারেন না। গভর্নর জেনারেলের মত তিনি সাক্ষাৎভাবে কোন বিষয় শাসনও করেন না।

ভাবে কোন কার্য করিলে, পার্লামেণ্ট ও সম্রাটের অনুরোধে প্রিভি-কাউন্সিল তাহা বিচার করিতে পারিবেন।

গভর্নর জেনারেলের বিশেষ দায়িত্ব (Special Responsibilities)—উপরি-উক্ত সংরক্ষিত বিষয়গুলি ছাড়া, নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে গভর্নর জেনারেলের **বিশেষ দায়িত্ব** রহিয়াছে :—

(১) ভারত বা তাহার অঞ্চলবিশেষের শান্তিভঙ্গের গুরুতর আশঙ্কা নিবারণ;

(২) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সুনাম সংরক্ষণ;

(৩) সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ন্যায়সঙ্গত দাবী সংরক্ষণ;

(৪) সরকারি কর্মচারিদের এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গের অধিকার ও ন্যায্য স্বার্থ সংরক্ষণ;

(৫) ব্রিটিশ প্রজাদিগের ভারতে বসবাস ও বাণিজ্যাদি সম্পর্কে বৈষম্য-মূলক কার্য প্রতিরোধ;

(৬) ভারতে ইংল্যাণ্ড ও ব্রহ্মদেশীয় দ্রব্যাদি রপ্তানি সম্পর্কে বৈষম্য-মূলক বা অসুবিধাজনক ব্যবস্থা প্রতিরোধ;

(৭) ভারতীয় রাজ্যসমূহের অধিকার এবং তাহাদের শাসকবর্গের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষণ; এবং

(৮) গভর্নর জেনারেলের "ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি অনুসারে" বা "নিজ বিবেচনা মত" কার্য করিবার অধিকার সংরক্ষণ।

এই বিষয়গুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভা এবং মন্ত্রিমণ্ডলীর অধিকারভুক্ত হইলেও, ইহাদের সম্বন্ধে গভর্নর জেনারেল "নিজ বিবেচনামত" এবং ভারত-সচিবের নির্দেশ * অনুসারেই ব্যবস্থা করিবেন। এই সকল

* গভর্নর জেনারেল কি ভাবে কোন্ কার্য করিবেন, তাহা আইনে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উল্লেখ করা সম্ভব নহে। তাই ব্যবস্থা হইয়াছে যে, পার্লামেণ্টের ইচ্ছানুযায়ী রাজা সময়ে সময়ে গভর্নর জেনারেলকে

বিভাগের সুশাসনের জন্য তিনি ভারত-সচিব এবং পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী।

আর্থিক উপদেষ্টা (Financial Adviser)—যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক বিধি-ব্যবস্থা সম্পর্কে গভর্নর জেনারেলের যে "বিশেষ দায়িত্ব" রহিয়াছে,সে বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য তিনি একজন **আর্থিক উপদেষ্টা** নিযুক্ত করিতে পারিবেন। ইঁহার কার্যকাল এবং বেতন প্রভৃতি গভর্নর জেনারেলই "নিজ বিবেচনামত" স্থির করিবেন। গভর্নর জেনারেলকে যুক্ত-রাষ্ট্রীয় আর্থিক স্বচ্ছলতা বিধানে সাহায্য করাই হইবে ইহার প্রধান কর্তব্য। অবশ্য, যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলীও এই উপদেষ্টার সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিবে। আর্থিক উপদেষ্টা কিন্তু আইন-সভার নিকট দায়ী নহেন। এই উপদেষ্টার নিয়োগ সম্বন্ধে গভর্নর জেনারেল প্রথমবার ব্যতীত অন্যান্যবার মন্ত্রি-সভার মত গ্রহণ করিতে পারেন।

এ্যাড্‌ভোকেট্‌ জেনারেল্‌ (Advocate General)—যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের বিচারক হইবার যোগ্য, এমন এক ব্যক্তিকে গভর্নর জেনারেল তাঁহার "ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি অনুসারে" যুক্তরাষ্ট্রের এ্যাড্‌ভোকেট্‌ জেনারেল নিযুক্ত করিবেন; অর্থাৎ ইঁহার নিয়োগ, পদচ্যুতি ও বেতনাদি সম্পর্কে গভর্নর জেনারেল মন্ত্রি-সভার মতও গ্রহণ করিতে পারিবেন। এ্যাড্‌ভোকেট্‌ জেনারেল কিন্তু আইন-সভার নিকট দায়ী হইবেন না; ইঁহার দায়িত্ব থাকিবে গভর্নর জেনারেলের

তাঁহার কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ লিপি (Instrument of Instructions) পাঠাইবেন। বর্তমানে ব্যবস্থা হইয়াছে যে, যে সব বিষয়ে গভর্নর-জেনারেলের ব্যক্তিগতভাবে নিজ বিবেচনায় কার্য করিবার অধিকার রহিয়াছে, সে সকল সম্পর্কে তিনি ভারত-সচিবের নির্দেশমত কার্য করিবেন। অবশ্য, ভারত-সচিবের এই নির্দেশ রাজোপদেশ লিপি-বিরোধী হইতে পারিবে না।

নিকট। গভর্নর জেনারেলের পরামর্শদাতা ও আর্থিক উপদেষ্টার মত তিনিও আইন-সভাদ্বয়ে বক্তৃতা করিতে এবং উহাদের কমিটি বিশেষের সভ্য হইতে পারিবেন। কিন্তু ইঁহাদের কাহারও, আইন-সভার সভ্য না হইলে, তথায় ভোট দিবার অধিকার থাকিবে না। এ্যাড্‌ভোকেট্ জেনারেল যুক্তরাষ্ট্রকে গভর্নর জেনারেলের নির্দেশমত ঘটিত ব্যাপারে উপদেশ দিবেন এবং আইন-সম্পর্কিত অন্যান্য কার্য সম্পাদন করিবেন। ব্রিটিশ ভারতের সমস্ত বিচারালয়ে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয় সম্বন্ধে দেশীয় রাজ্যের বিচারালয়ে তাঁহার নিজ বক্তব্য বলিবার অধিকার থাকিবে।

মন্ত্রীরা অনেক বিষয় পরিচালন করিলেও, গভর্নর জেনারেলের হাতেই প্রকৃতপক্ষে ভারত-শাসনের শেষ কর্তৃত্ব রাখা হইয়াছে। তিনি নানাভাবে প্রায় ৮০ দফা কার্যে মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়াও পারিবেন। অন্যান্য বিষয়েও মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করিলেই যে তিনি তাঁহাদের মতানুসারে কার্য করিতে বাধ্য থাকিবেন, তাহা নহে। অবশ্য, এই শেষোক্ত অবস্থায় তাঁহাকে ভারত-সচিবের নির্দেশ মানিয়া চলিতে হইবে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় দপ্তরখানা (Federal Secretariate)—শাসন-কার্যের সুবিধার জন্য শাসন-বিষয়সমূহকে কতগুলি বিভাগে ভাগ করা হইয়াছে। প্রত্যেক মন্ত্রীর উপরে এক বা একাধিক বিভাগের পরিচালনা-ভার থাকিবে। মন্ত্রিগণ তাঁহাদের নিজ নিজ বিভাগের জন্য দায়ী থাকিবেন ; এবং বিলাতের মন্ত্রিমণ্ডলীর মত ইঁহাদের যুক্তদায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে, ইঁহাদের প্রত্যেকের কার্যের জন্যই সকলকে সম্মিলিতভাবে দায়ী হইতে হইবে।

মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যে **অর্থ-সচিব**-এর দায়িত্ব হইবে যুক্তরাষ্ট্রের আয়-ব্যয়ের ব্যবস্থা করা এবং বাৎসরিক বাজেট (আয়-ব্যয়ের হিসাব)

আইন-সভায় পেশ করাই হইবে আর্থিক বিভাগের প্রধান কার্য। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ গচ্ছিত রাখা, নোট প্রচলন, মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিতও অর্থ-সচিবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিবে।

বাণিজ্য-বিভাগ অপর এক মন্ত্রীর অধীনে থাকিবে। তাঁহার সহিত যুক্তরাষ্ট্রীয় রেলওয়ে কর্তৃপক্ষেরও নিবিড় সম্পর্ক থাকিবে। দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন-বিভাগ থাকিবে **স্বরাষ্ট্র-সচিবের** হাতে। এই ভাবে আইন, শিল্প, শিক্ষা ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগ বিভিন্ন মন্ত্রীর শাসনাধীনে ন্যস্ত হইবে।

এই মন্ত্রীদিগকে তাঁহাদের শাসন-কার্যে সাহায্য করিবার জন্য প্রত্যেক বিভাগেই একাধিক **সেক্রেটারি** থাকিবে। মন্ত্রীরা শাসনের মূল নীতি নির্ধারণ করিয়া দিবেন এবং এই সেক্রেটারিবর্গ তাহা কার্যে পরিণত করিবেন। সরকারের স্থায়ী কর্মচারি এই সেক্রেটারিগণই তাঁহাদের অভিজ্ঞতার সাহায্যে পরিবর্তনশীল মন্ত্রীদিগকে পরামর্শ দিয়া সুপরিচালিত করিবেন। ভারতীয় সিভিল্ সার্ভিসের লোকই সাধারণত সেক্রেটারি নিযুক্ত হইবেন, কিন্তু প্রধানত মন্ত্রীদের নিকটই ইঁহাদের দায়িত্ব থাকিবে। সেক্রেটারিগণ ও তাঁহাদের অধীনস্থ কর্মচারি লইয়াই যুক্তরাষ্ট্রীয় দপ্তরখানা গঠিত হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভা

(Federal Legislature)

সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে গভর্নর জেনারেল এবং রাষ্ট্র-পরিষদ (Council of State) ও সম্মিলিত পরিষদ (House of Assembly) নামক দুইটি পরিষদ লইয়া ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভা গঠিত হইবে। এই উভয় পরিষদেই ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর-শাসিত প্রদেশ এবং চীফ্ কমিশনারাধীন অঞ্চলের প্রতিনিধি থাকিবেন। তাহা ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী দেশীয় করদ এবং মিত্ররাজ্যসমূহও এই উভয় পরিষদেই প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবেন। গভর্নর জেনারেলের সম্মতি ব্যতীত কোন আইনই কার্যকরী হইবে না। তাই, গভর্নর জেনারেলকেও আইন-সভার এক অপরিহার্য অঙ্গরূপে গণ্য করিতে হইবে।

রাষ্ট্র-পরিষদ (Council of State)—ইহাই যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভার ঊর্ধ্ব পরিষদ। ইহাতে ২৬০ জনের বেশি সভ্য থাকিতে পারিবেন না। ইহাদের মধ্যে ১৫৬ জন হইবেন ব্রিটিশ ভারতের প্রতিনিধি এবং বাকি ১০৪ জন দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি।

ব্রিটিশ ভারতের জন্য এই পরিষদে জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে ৭৫টি সাধারণ সভ্যপদের (general seats) ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া অনুন্নত হিন্দু, শিখ, মুসলমান, ইঙ্গ-ভারতী (Anglo-Indian), ইউরোপীয়, দেশীয় খ্রীষ্টান এবং মহিলাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সভ্যপদেরও ব্যবস্থা রহিয়াছে * সমস্ত ব্রিটিশ ভারতীয় সভ্যপদের মোটামুটি ⅓ অংশ মুসলমানদিগকে দেওয়া হইয়াছে।

---

* সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথা অনুসারে।

এই ব্যবস্থানুসারে বাংলাদেশ মোট ২০ জন সভ্য পাঠাইতে পারিবে ; তাহার মধ্যে ৮ জন সাধারণ, ১ জন অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত, ১০ জন মুসলমান এবং ১ জন মহিলা।*

এই রাষ্ট্র-পরিষদ কিন্তু স্থায়ী পরিষদ হইবে ; কেন না, ইহা প্রথমবার ভিন্ন অন্য কোন বারেই সম্পূর্ণ নূতন সভ্য লইয়া গঠিত হইবে না। ইহার ⅓ অংশ সভ্য প্রত্যেক ৩ বৎসর অন্তর অবসর গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহাদের স্থানে নূতন সভ্য নির্বাচিত হইবেন। প্রথম-বারে নির্বাচিত সভ্যদের ⅓ অংশ ৩ বৎসরের জন্য, অপর ⅓ অংশ ৬ বৎসরের জন্য এবং বাকি ⅓ অংশ ৯ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন। অতঃপর প্রত্যেক সভ্য ৯ বৎসর কাল সভ্য থাকিবেন।

এই পরিষদের উপরিউক্ত ১৫৬টি ব্রিটিশ ভারতীয় সভ্যপদের মধ্যে ১৫০টি প্রদেশসমূহকে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে ; বাকি ৬টি সভ্যপদে গভর্নর জেনারেল তাঁহার নিজ বিবেচনামত সভ্য **মনোনীত** করিবেন। ইঙ্গ-ভারতীয় (Anglo-Indian) ইউরোপীয় এবং দেশীয় খ্রীষ্টান প্রতিনিধিগণ আবার প্রাদেশিক আইন-সভার নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সভ্যগণ কর্তৃক **পরোক্ষভাবে নির্বাচিত** (indirectly elected) হইবেন। অবশিষ্ট ব্রিটিশ ভারতীয় প্রতিনিধিবৃন্দ নিজ নিজ প্রাদেশিক নির্বাচকগণ কর্তৃক **সাক্ষাৎভাবে নির্বাচিত** (directly elected) হইবেন।

যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী **দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিবর্গ** রাজন্যবৃন্দ কর্তৃক **মনোনীত** হইবেন। বড় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিবর্গ ৯ বৎসরই সভ্য থাকিবেন ; কিন্তু ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিগণ

---

* অন্যান্য প্রদেশ, চীফ্ কমিশনার-শাসিত অঞ্চল প্রভৃতির সভ্য-সংখ্যা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

৩ বৎসর বা তাহা হইতেও অল্পকাল সভ্য থাকিতে পারিবেন না। হায়দ্রাবাদ, মহীশূর প্রভৃতি বৃহত্তর রাজ্যসমূহ ভিন্ন ভিন্ন সভ্যপদ পাইলেও ক্ষুদ্রতর রাজ্যগুলি যুক্তভাবে সভ্যপদ পাইবে।

অন্তত ৩০ বৎসর বয়স্ক ব্রিটিশ প্রজা, যুক্তরাষ্ট্রান্তর্গত রাজ্যের রাজা বা প্রজা ব্যতীত অন্য কেহ রাষ্ট্রপরিষদের সভ্য হইতে পারিবে না। রাষ্ট্র-পরিষদের নির্বাচনে ভোটদাতা না হইলেও, কেহ এই পরিষদের ব্রিটিশ ভারতীয় সভ্য হইতে পারিবে না।

রাষ্ট্র-পরিষদের সভ্যরাই নিজের মধ্য হইতে উহার সভাপতি ও সহকারী সভাপতি নির্বাচন করিবেন। সভাপতি ও সহকারী সভাপতি ইচ্ছামত পদত্যাগ করিতে পারিবেন এবং সভ্যদেরও ইঁহাদিগকে প্রয়োজনমত পদচ্যুত করিবার অধিকার থাকিবে। সভাপতি ও সহকারী সভাপতির বেতন পরিষদই ভোটদ্বারা নির্ধারিত করিবে।
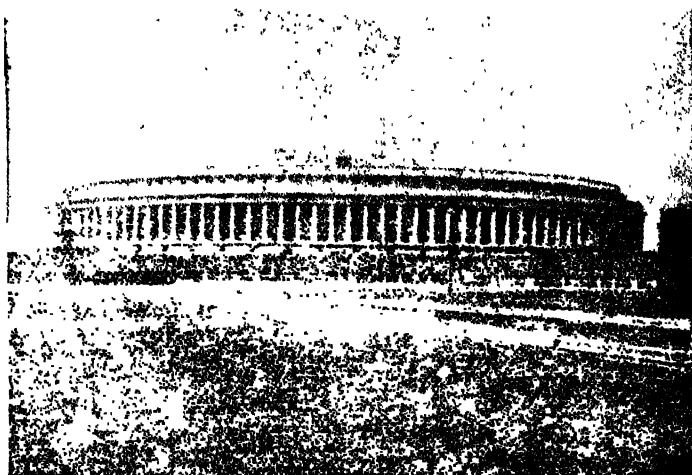
দিল্লী আইন-সভার বৃত্তাকার গৃহ (rotunda)

সম্মিলিত পরিষদ (House of Assembly)—ইহা যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভার নিম্ন পরিষদ। ইহার মোট ৪৭৫ জন সভ্যের মধ্যে ২৫০ জন ব্রিটিশ ভারতের এবং ১২৫ জন দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি থাকিবেন। এই পরিষদে ব্রিটিশ ভারতের জন্য জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে ১৫০টি সাধারণ সভ্যপদের (general seats) ব্যবস্থা রহিয়াছে। তন্মধ্যে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য ১৯টি আসন রক্ষিত হইবে। ইহা ছাড়া, শিখ, মুসলমান, ইঙ্গ-ভারতীয় (Anglo Indian) ইউরোপীয় দেশীয় খ্রীষ্টান এবং মহিলাদের জন্য এই পরিষদেও ভিন্ন ভিন্ন সভ্যপদ নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। আর জমিদার, শ্রমিক এবং শিল্প ও বাণিজ্যের জন্যও এই সম্মিলিত পরিষদে ভিন্ন ভিন্ন সভ্যপদ নির্দিষ্ট রহিযাছে।

এই ব্যবস্থানুসারে, বাংলাদেশ ৩৭টি সভ্যপদ পাইবে; তাহার মধ্যে ১০টি সাধারণ (তন্মধ্যে ৩টি অনুন্নত সম্প্রদায়), ১৭টি মুসলমান, একটি ইঙ্গ-ভারতীয়, একটি ইউরোপীয়, একটি দেশীয় খ্রীষ্টান, তিনটি শিল্প ও বাণিজ্য, একটি জমিদার, একটি শ্রমিক এবং দুইটি মহিলাদের জন্য।

যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী **দেশীয় রাজ্যসমূহের সভ্য-সংখ্যা** মোটামুটি তাহাদের জন-সংখ্যার অনুপাতেই নির্দিষ্ট হইয়াছে। দেশীয় রাজ্যের এই প্রতিনিধি কিন্তু নরপতিগণ কর্তৃক **মনোনীত** হইবেন। * ব্রিটিশ ভারতীয় প্রতিনিধিসকল নিজ নিজ প্রাদেশিক আইন-সভা কর্তৃক **পরোক্ষ ভাবে নির্বাচিত** (indirectly elected) হইবেন।†

---

* জন-সংখ্যার দিক দিয়া, ব্রিটিশ ভারতের তুলনায় দেশীয় রাজ্যগুলি হইতে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভার উভয় পরিষদেই অনেক বেশি সভ্য প্রেরিত হইবেন।

† এই পরোক্ষ নির্বাচনের ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় সম্মিলিত পরিষদের নিখিল-ভারতীয় কার্যসমূহ সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা দ্বারা ব্যাহত হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা রহিয়াছে। গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে সর্বত্রই অন্তত নিম্ন পরিষদে জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ নির্বাচন (direct election) হইয়া

প্রতি ৫ বৎসর অন্তর এই সম্মিলিত পরিষদের নির্বাচন হইবে। কিন্তু গভর্নর জেনারেল ইচ্ছা করিলে, ঐ ৫ বৎসরের পূর্বেও ইহা ভাঙ্গিয়া দিয়া নব-নির্বাচিত সভ্য লইয়া নূতন পরিষদ গঠন করিতে পারিবেন।

এই সম্মিলিত পরিষদের সভাপতি (Speaker) ও সহকারী সভাপতি (Deputy Speaker) সভ্যরা নিজেদের মধ্য হইতেই নির্বাচিত করিবেন। সভাপতি ও সহকারী সভাপতির পদচ্যুতি এবং বেতন নির্ধারণের ভারও সভ্যদের হাতেই থাকিবে।

আইন-সভার ক্ষমতা—১৯৩৫ সালের এই নূতন আইনে যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং প্রাদেশিক শাসন-বিষয়সমূহ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সামরিক, বৈদেশিক, মুদ্রা ও ডাক-বিভাগ প্রভৃতি যে সকল বিষয়ে সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে একই প্রকার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, সেই বিষয়গুলিই যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভা এবং কর্ম-বিভাগের অধীনে থাকিবে। ইহা ছাড়া, দেশীয় রাজ্যসমূহের যুক্তরাষ্ট্র-প্রবেশ-লিপি অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রে প্রদত্ত বিষয়গুলিও যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভা এবং কর্ম-বিভাগের হাতেই থাকিবে।

আবার, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ভূমি-কর, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রভৃতি যে সকল বিষয়ে প্রাদেশিক বৈশিষ্ট যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ব্যবস্থা রাখা বাঞ্ছনীয়, সেই বিষয়গুলি থাকিবে প্রাদেশিক আইন-সভা এবং কর্ম-বিভাগের অধীনে।

কিন্তু, ভারতীয় দণ্ড-বিধি, শ্রমিক আইন ও সংক্রামক ব্যাধি ইত্যাদি

থাকে। ফলে, দেশের আইন-কানুন যথাসম্ভব জনসাধারণের ইচ্ছামতই প্রণীত হয়। কিন্তু ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় নিম্ন পরিষদে পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অবশ্য শাসন-তন্ত্রে ব্যবস্থা রহিয়াছে যে, যুক্ত-রাষ্ট্রীয় আইন-সভা প্রত্যক্ষ নির্বাচনের জন্য ভবিষ্যতে পার্লামেণ্টকে অনুরোধ করিলে, পার্লামেণ্ট তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

বিষয়ে একদিকে যেমন প্রদেশগুলির নিজ নিজ প্রয়োজনমত ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক, অন্যদিকে তেমনি নিখিল ভারতীয় স্বার্থে কতকগুলি সর্বভারতব্যাপী সাধারণ ব্যবস্থাও করা কর্তব্য। তাই, এই সব বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক আইন-সভা উভয়েরই **যুগ্ম** (concurrent) **অধিকার** থাকিবে। অবশ্য, এই যুগ্মাধিকারভুক্ত বিষয়সমূহে প্রকৃতপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রেরই অধিকার রাখা হইয়াছে; কেন না, এই সব বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভা কোন আইন পাশ করিলে, উহার ধারাগুলির বিরোধী কোন প্রাদেশিক আইন কার্যকরী হইবে না।

এই আইনে যুক্তরাষ্ট্রীয়, প্রাদেশিক এবং উভয়ের যুগ্মাধিকারভুক্ত বিষয়সমূহ এমন বিস্তৃতভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে যে, শাসন-ব্যবস্থার সকল বিষয়ই উহার কোন-না-কোন তালিকার (list) ভিতরে পড়িয়াছে। তথাপি, ইহার বাহিরে কোন নূতন বিষয় সম্পর্কে ভবিষ্যতে ব্যবস্থার প্রয়োজন হইতেও পারে। এইরূপ **অনির্দেশিত** (residuary) বিষয়ের বিলিব্যবস্থা গভর্নর জেনারেল, তাঁহার নিজ বিবেচনামত, যুক্তরাষ্ট্রীয় বা প্রাদেশিক আইন-সভার হাতে ন্যস্ত করিতে পারিবেন।

নির্দিষ্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় ও যুগ্মাধিকারভুক্ত বিষয়সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভা সমগ্র ব্রিটিশ ভারত এবং মোটামুটিভাবে যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী দেশীয় রাজ্যসমূহ সম্বন্ধে আইন করিতে পারিবে। এইভাবে সামরিক, বৈদেশিক, মুদ্রা, শুল্ক ও ডাক-বিভাগ প্রভৃতি ৫৯টি **নির্দিষ্ট** বিষয় যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভার অধিকারে থাকিবে। আর, ফৌজদারী ও দেওয়ানি কার্য্য-বিধি; সংবাদ-পত্রাদি; আইন 'চিকিৎসা প্রভৃতি ব্যবসায়; শ্রমিক ও কারখানা ইত্যাদি ৩৬টি **যুগ্মাধিকারভুক্ত** বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকার উভয়েরই আইন করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

ইহা ছাড়া, গভর্নর জেনারেল নিজ বিবেচনামত **"জরুরী অবস্থা"** সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিলে, (পুলিস, জেল, স্থানীয় স্বায়ত্ত-

শাসন প্রভৃতি ৫৪টি) নির্দিষ্ট প্রাদেশিক বিষয় সম্বন্ধেও যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভা আইন করিতে পারিবে। * আবার, একাধিক প্রাদেশিক আইন-সভার অনুরোধে নির্দিষ্ট প্রাদেশিক বিষয়েও যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভা কেবল ঐ প্রদেশসমূহের জন্য আইন করিয়া দিতে পারিবে।

চীফ্ কমিশনারাধীন অঞ্চলসমূহের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভা প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় উভয়শ্রেণীর বিষয় সম্বন্ধেই আইন করিতে পারিবে।

বৈদেশিক সন্ধি ও চুক্তিসম্পর্কিত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের হাতে থাকিলেও, গভর্নর বা যুক্তরাষ্ট্রান্তর্গত দেশীয় রাজ্যের রাজাদিগের সম্মতি ব্যতীত প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে ঐ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভা কোন আইন করিতে পারিবে না।

প্রাদেশিক আইন-সভা কিংবা পার্লামেণ্ট অথবা সম্রাট্ বা তাঁহার পরিবারবর্গের ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হয়, এমন কোন আইন করিবার ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভার থাকিবে না। গভর্নর জেনারেলের অনুমতি ভিন্ন কতকগুলি বিষয় † সম্বন্ধে আবার কোন প্রস্তাব বা আলোচনা যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভায় উপস্থাপিত হইতেও পারিবে না।

---

* এই জরুরী বিধান পার্লামেণ্টের সম্মতি থাকিলে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কার্যকরী থাকিবে ; নতুবা গভর্নর জেনারেলের "জরুরী অবস্থা" ঘোষণা প্রত্যাহারের ছয় মাস পরে উহা বাতিল হইয়া যাইবে।

যুদ্ধকালে ১৯৩৯ ও ১৯৪০ সনের আইনের ধারা পরিবর্তন দ্বারা পার্লামেণ্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে জরুরী অবস্থায়, নানা বিধি (rules) করিবার ও আইন বলবৎ করিবার কার্যকরী ক্ষমতাও দিয়াছে। এমন কি, সম্রাট্ ও সেক্রেটারী-অফ্-ষ্টেট-এর অনুমোদন সাপেক্ষ বিষয়ে গভর্নর জেনারেলের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

† যথা :—

(১) ব্রিটিশ ভারত সম্পর্কিত পার্লামেণ্টের আইন ,

(২) গভর্নর জেনারেল বা গভর্নরের আইন ;

বিচারকগণ যাহাতে জনসাধারণের অধিকারগুলি (rights) স্বাধীনভাবে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহার জন্য ব্যবস্থা হইয়াছে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় (Federal Court) এবং প্রাদেশিক বা সংশ্লিষ্ট দেশীয় রাজ্যের উচ্চ আদালতের (High Court) বিচারকদের কার্য সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভার কোন সমালোচনার অধিকার থাকিবে না, তেমনি, আইন-সভার কর্ম-প্রণালীও কোন বিচারালয়ের বিচারযোগ্য হইবে না।

আইন-সভার কর্ম-প্রণালী—যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভার উভয় পরিষদই নিজ নিজ কর্ম-প্রণালী স্থির করিয়া লইবে; তবে গভর্নর জেনারেল তাঁহার বিশেষ-দায়িত্ব সম্পর্কিত কার্য সুপরিচালনার জন্য আইন-সভার এই কর্ম-প্রণালী প্রয়োজন মত পরিবর্তন করিতে পারিবেন। এই আইন-সভার কার্য্য ইংরেজিতেই হইবে, কিন্তু ইংরেজি অনভিজ্ঞ সভ্যের মাতৃভাষাতেও বক্তৃতা করিবার অধিকার থাকিবে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভার উভয় পরিষদেরই বৎসরে অন্তত একবার অধিবেশন হওয়া চাই। এই সভার অধিবেশন আহ্বান করিবেন গভর্নর জেনারেল এবং তিনিই নূতন নির্বাচনের জন্য নিম্ন পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিবেন। তিনি নিজ বিবেচনামত ইহার যে কোন পরিষদে

---

(৩) গভর্নর জেনারেলের "নিজ বিবেচনামত" করণীয় কার্য;

(৪) পুলিস-সম্বন্ধীয় আইন;

(৫) ব্রিটিশ প্রজা সম্পর্কিত নির্দিষ্ট ফৌজদারি বিচার-বিধি;

(৬) ব্রিটিশ-ভারতীয় ব্যক্তি বা ব্যবসায়ী কোম্পানী অপেক্ষা অন্য কোন ব্যক্তি বা কোম্পানীর উপর অধিক কর নির্ধারণ;

(৭) আইন, চিকিৎসা ইত্যাদি ব্যবসায় বা কোন বাণিজ্যের গুণাগুণ নির্ধারণ;

(৮) ইংল্যাণ্ডে আয়কর দিয়া থাকিলে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়কর হইতে নিষ্কৃতি দানের বিরোধিতা।

বা উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে বক্তৃতা করিতে অথবা বাণী প্রেরণ করিতে পারিবেন। ইহা ছাড়া, পরিষদদ্বয়ের সভাপতিদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশন আহ্বানের ক্ষমতাও তাহার থাকিবে। কোন প্রস্তাবের (Bill) আলোচনায় দেশের শান্তি ভঙ্গ হইবার আশঙ্কা থাকিলে, গভর্নর জেনারেল উহার আলোচনা বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন।

কোন বিষয়ে পরিষদ দুইটির মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে, ঊর্ধ্ব পরিষদের সভাপতির সভাপতিত্বে উহাদের এক যুক্ত অধিবেশন হইবে। এই যুক্ত অধিবেশনে উভয় পরিষদের সভ্যবৃন্দের মিলিত ভোটাধিক্যেই উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। আলোচ্য বিষয়ের সমর্থনকারী ও বিরুদ্ধবাদী দলের ভোট-সংখ্যা সমান হইলেই কেবল ঊর্ধ্ব পরিষদের সভাপতি এইরূপ অধিবেশনের সভাপতি হিসাবে ভোট দিতে পারিবেন।

অন্তত ⅙ অংশ সভ্য উপস্থিত না থাকিলে, কোন পরিষদেরই কার্য চলিতে পারিবে না।

সভ্যদের সম্বন্ধে বিধান—সভ্যগণ যাহাতে রাজা ও প্রচলিত শাসন-তন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ না করেন, সেইজন্য তাঁহাদের রাজানুগত্যের শপথ গ্রহণ করিতে হইবে। কেহই একসঙ্গে উভয় পরিষদের সভ্য হইতে পারিবেন না। কোন সভ্য একাদিক্রমে ৬০ দিন অনুপস্থিত থাকিলে, পরিষদ তাঁহাকে সভ্যপদ হইতে অপসারিত করিতে পারিবে। আইন-সভা বা উহার কোন কমিটিতে বক্তৃতা বা ভোটের জন্য সভ্যগণ দণ্ডনীয় হইবেন না। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভা পৃথক ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত এই আইন-সভা সভ্যদের বর্তমান কেন্দ্রীয় আইন-সভার সভ্যদের মত সুযোগ-সুবিধা থাকিবে। সভ্যরা যে বেতন ও ভাতা পাইবেন, তাহার হার যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভাই নির্ধারণ করিবে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ আইন-সভার সভ্য হইতে পারিবে না :—

(১) বেতনভোগী সরকারি কর্মচারি (মন্ত্রী প্রভৃতি ব্যতীত) ;

(২) বিচারালয় কর্তৃক পাগল সাব্যস্ত ব্যক্তি ;

(৩) দেউলিয়া ;

(৪) নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট অপরাধে অপরাধী (নির্দিষ্ট কালের জন্য মাত্র), এবং (৫) দ্বীপান্তর বা অন্য ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তি (নির্দিষ্ট কালের জন্য)।

আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি—আর্থিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত আইন-প্রস্তাব (Financial Bill) ব্যতীত সকল আইন-প্রস্তাবই (Bill) যে কোন পরিষদেই উত্থাপিত হইতে পারিবে। কিন্তু কোন আইন-প্রস্তাবই উভয় পরিষদে গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভা কর্তৃক গৃহীত বলিয়া গণ্য হইবে না। এইরূপে আর্থিক বিধান ব্যতীত অন্যান্য সকল বিষয়েই উভয় পরিষদের সমান ক্ষমতা থাকিবে। কোন বিষয়ে উভয় পরিষদের মতবিরোধ হইলে, গভর্নর জেনারেল পরিষদ দুইটির **যুক্ত-অধিবেশন** আহ্বান করিয়া ভোটাধিক্যে উহার চূড়ান্ত মীমাংসা করাইতে পারিবেন। ইহা ছাড়া, কোন আথিক অথবা তাঁহার নিজ দায়িত্ব সম্পর্কিত বিল সত্বর পাশ করাইবার জন্যও উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিতে পারিবেন।

পরিষদদ্বয় কর্তৃক বিল পাশ হইলে, (১) গভর্নর জেনারেল সম্রাটের নামে উহাতে সম্মতি দিবেন, বা (২) অগ্রাহ্য করিবেন, বা (৩) সম্রাটের অনুমোদনের জন্য উহা স্থগিত রাখিয়া দিবেন, বা (৪) পুনর্বিবেচনার জন্য উহা উভয় পরিষদের নিকট প্রেরণ করিবেন। সাধারণত, গভর্নর জেনারেলের বা উপরিউক্তভাবে রক্ষিত বিলের ক্ষেত্রে, উভয় পরিষদে গৃহীত হইলেও, সম্রাটের অনুমতি ব্যতীত কোন আইন কার্যকরী

হইবে না। উভয় পরিষদে গৃহীত এবং গভর্নর জেনারেলের সম্মতি-প্রাপ্ত আইনও ১২ মাসের মধ্যে সম্রাট্ বাতিল করিতে পারিবেন।

আর্থিক বিধি-প্রণয়ন—গণতন্ত্রে কর্ম-বিভাগ শাসন-পরিচালনার জন্য, প্রয়োজনীয় আয়-ব্যয়ের একটা বাৎসরিক হিসাব আইন-সভার নিকট পেশ করে। আর, রাজশক্তির পরিচালক-সঙ্ঘ হিসাবে আইন-সভা উহার কোন্ ব্যয় কি ভাবে (অর্থাৎ, কোন্ কোন্ কর বসাইয়া) মিটান যাইবে, তাহার নির্দেশ দিয়া দেয়। যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কেও তাই ব্যবস্থা হইয়াছে যে, গভর্নর-জেনারেল তাঁহার মন্ত্রি-মণ্ডলী দ্বারা প্রতি বৎসরই এপ্রিল হইতে মার্চ পর্যন্ত আর্থিক বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব (Budget) আইন-সভার নিকট উপস্থিত করাইবেন।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে উপনিবেশের মত আর্থিক ব্যাপারে চরম কর্তৃত্ব দেওয়া হয় নাই। বর্তমান আইনে নির্দিষ্ট কতিপয় বিষয় যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভার অধিকারের বাহিরে রাখা হইয়াছে। কর্ম-বিভাগের কর্তারূপে গভর্নর জেনারেল উপরিউক্ত অবশ্য দেয় অর্থ ব্যতীত অন্য সব বিষয়ক অর্থ অনুমোদনের জন্য **প্রথমে নিম্ন পরিষদে** ও পরে ঊর্ধ্ব পরিষদে উপস্থাপিত করাইবেন। উভয় পরিষদই উহা হ্রাস বা নামঞ্জুর করিতে পারিবে। নিম্ন পরিষদ কোন অর্থ নামঞ্জুর করিলে গভর্নর জেনারেল বিশেষ নির্দেশ ব্যতীত উহা ঊর্ধ্ব পরিষদের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত হইবে না।

নিম্নলিখিত ব্যয়গুলি ভারতীয় রাজস্ব হইতে অবশ্য দেয় বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে :—

(১) গভর্নর জেনারেলের বেতনাদি ;

(২) সরকারি ঋণ ও তাহার সুদ ;

(৩) গভর্নর জেনারেলের মন্ত্রী, পরামর্শদাতা, আর্থিক উপদেষ্টা, এ্যাড্ভোকেট্-জেনারেল, চীফ্ কমিশনার প্রভৃতির বেতনাদি ;

(৪) যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় এবং উচ্চ আদালতের বিচারকদের বেতন ও পেন্সনাদি ;

(৫) গভর্নর জেনারেলের দেশরক্ষা, যাজকীয় ব্যাপার, বৈদেশিক সম্পর্ক, সীমান্তের উপজাতি সম্বন্ধীয় কর্তব্য এবং "নিজ বিবেচনামত" শাসনাধীন অঞ্চলের শাসন-ব্যয় ;

(৬) ভারতীয় রাজ্যসমূহ সম্পর্কে সম্রাটের কর্তব্য সম্পাদনের প্রয়োজনীয় অর্থ ;

(৭) প্রদেশে সাধারণ-শাসন-বহির্ভূত অঞ্চল (excluded areas) শাসনের নিমিত্ত দান ;

(৮) আদালতের ডিক্রি মিটাইবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ;

(৯) এই আইনে যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব হইতে দেয় বলিয়া নির্দেশিত অন্যান্য খরচ।

যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব হইতে অবশ্য দেয় উপরিউক্ত ব্যয়সমূহ, যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভার অনুমোদন-সাপেক্ষ অন্যান্য খরচ এবং গভর্নর জেনারেল তাঁহার "বিশেষ দায়িত্ব" পালনের নিমিত্ত যে অর্থের প্রয়োজন মনে করেন তাহা, বাজেটে ভিন্ন ভাবে প্রদর্শিত হইবে। এই নয় দফার অবশ্য দেয় অর্থ সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভার ভোট প্রদানের অধিকারও থাকিবে না। তবে গভর্নর-জেনারেলের বেতনাদি ও দেশীয় রাজ্যসমূহ সম্পর্কে সম্রাটের কর্তব্য সম্পাদনে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যতীত উপরিউক্ত অন্যান্য বিষয়ের অর্থ সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভা আলোচনা করিতে পারিবে, কিন্তু ভোট দিতে পারিবে না।

কোন আর্থিক দাবী সম্বন্ধে উভয় পরিষদের মত বিরোধ হইলে, গভর্নর জেনারেল উহাদের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিয়া, ঐ দাবী সম্বন্ধে সভ্যদের ভোটাধিক্যে উহার শেষ মীমাংসা করাইয়া লইবেন। ব্রিটেন প্রভৃতি অধিকাংশ গণতন্ত্রের মত আর্থিক ব্যাপারে নিম্ন পরিষদকে

ঊর্ধ্ব পরিষদের মত বিরুদ্ধে নিজমত কার্যকরী করিবার বিশেষ কোন ক্ষমতা অবশ্য দেওয়া হয় নাই। কিন্তু উপরিউক্ত অধিবেশনের ব্যবস্থায় কার্যত ঊর্ধ্ব পরিষদের মতের বিরুদ্ধেও নিম্ন পরিষদের মত কার্যকরী হইবে ; কেননা, নিম্ন পরিষদের সভ্য-সংখ্যা অধিক।

এই যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য বিষয়ের মত আর্থিক ব্যাপারেও আইন-প্রণয়নের যথেষ্ট ক্ষমতা গভর্নর জেনারেলকে দেওয়া হইয়াছে। আরও ব্যবস্থা রহিয়াছে যে, নিজ দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত গভর্নর জেনারেল আইন-সভার মতের বিরুদ্ধেও প্রয়োজন মত অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যয় সাপেক্ষ কোন আইনের প্রস্তাব (Bill), গভর্নর জেনারেলের মত ব্যতীত, আইন-সভা পাশ করিতে পারিবে না। আবার কর, ঋণ এবং যুক্তরাষ্ট্রের অবশ্য দেয় অর্থ ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন বিল গভর্নর জেনারেলের অনুমতি ছাড়া আইন-সভায় উত্থাপিতও হইতে পারিবে না।

গভর্নর জেনারেলের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা—বিশেষ জরুরি অবস্থা ঘটিলে গভর্নর জেনারেল প্রয়োজনমত দুই শ্রেণীর **অর্ডিন্যান্স** (ordinance) প্রণয়ন করিতে পারিবেন। এই অর্ডিন্যান্স আইন-সভার আইনের মতই কার্যকরী হইবে। (১) আইন-সভার অধিবেশন বন্ধ থাকা কালে অনতিবিলম্বে আইন প্রণয়ন একান্ত আবশ্যক হইলেই তিনি এই স্বল্পকালস্থায়ী আইন বা অর্ডিন্যান্স করিতে পারিবেন। অবশ্য, যে বিষয়ে আইন করিতে হইলে আইন-সভাকে গভর্নর জেনারেলের পূর্ব সম্মতি (previous sanction) লইতে হইত, এমন বিষয়ে অর্ডিন্যান্স করিবার কালে গভর্নর জেনারেল তাঁহার "ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি অনুসারে" কার্য করিবেন। কিন্তু সম্রাটের সম্মতির জন্য রক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে তিনি সম্রাটের অনুমতি ব্যতীত অর্ডিন্যান্স করিতে পারিবেন না। এই সকল অর্ডিন্যান্স আইন-সভার পরবর্তী অধিবেশনের পরে আর

বলবৎ থাকিবে না এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভা উহা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভার ক্ষমতার বহির্ভূত কোন বিষয়ে এই শ্রেণীর অর্ডিন্যান্স চলিবে না।

(২) গভর্নর জেনারেলের যে সকল শাসন-দায়িত্ব রহিয়াছে, তাহা প্রতিপালনের জন্যও প্রয়োজনমত তিনি অর্ডিন্যান্স করিতে পারিবেন। এই শ্রেণীর অর্ডিন্যান্স ছয় মাসের বেশি দিন বলবৎ থাকিবে না; অবশ্য, উহা আরও ছয় মাস পর্যন্ত পরিবর্ধিত হইতে পারিবে, কিন্তু তাহা হইলে উহা পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করিতে হইবে। এই শ্রেণীর অর্ডিন্যান্সও যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভার ক্ষমতার বহির্ভূত বিষয়ে কার্যকরী হইবে না। এই বিষয়ে গভর্নর জেনারেল তাঁহার "নিজ বিবেচনামত" কার্য করিবেন।

আবার, গভর্নর জেনারেলের যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভার উভয় পরিষদকে জানাইয়া বিল বিশেষকে অবিলম্বে নিজেই আইনে পরিণত করিতে পারিবেন; অথবা, প্রয়োজনীয় আইন পাশ করিবার জন্য উভয় পরিষদেই তিনি সংবাদ প্রেরণ করিতে পারিবেন। যদি সেই সংবাদের সঙ্গে তিনি বিলের খসড়া পাঠান, তবে একমাস পরেই তিনি উহা **"গভর্নর জেনারেলের আইন"** (Governor-General's Act)-রূপে ঘোষণা করিতে পারিবেন। গভর্নর জেনারেলের এই সকল আইনও যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভা কর্তৃক প্রণীত আইনের মতই কার্যকরী হইবে। অবশ্য, "গভর্নর জেনারেলের আইন "ভারত-সচিব দ্বারা পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করিতে হইবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভার অধিকার বহির্ভূত বিষয়ে "গভর্নর-জেনারেলের আইন" কার্যকরী হইবে না। গভর্নর জেনারেল "নিজ বিবেচনামত" এই কার্য করিবেন।

শাসনতন্ত্র বিকলে ব্যবস্থা—গভর্নর জেনারেল যদি কখনও মনে করেন যে, এই আইনের বিধানমত শাসনকার্য পরিচালনা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে, তবে "নিজ বিবেচনামত" স্বীয় কর্তব্য সম্পাদনের জন্য

ঘোষণা (Proclamation) দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের যে কোন ক্ষমতা নিজে গ্রহণ করিতে পারিবেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের (Federal Court) ক্ষমতা তখনও অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এই ঘোষণা পার্লামেণ্টের বিজ্ঞপ্তির জন্য অবিলম্বে ভারত-সচিবকে জানাইতে হইবে। এই প্রকার ঘোষণা ছয় মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে, কিন্তু পার্লামেণ্ট অনুমোদন করিলে ইহা পুনরায় কার্যকরী হইতে পারিবে।

একাদিক্রমে তিন বৎসর পর্যন্ত এইরূপ ঘোষণামত শাসন চলিলে, উহার কার্যকাল শেষ হইয়া যাইবে। তখন পার্লামেণ্ট অপর কোন সংশোধন না করিলে, বর্তমান আইন মতই শাসন পরিচালিত হইবে।

এইরূপ ঘোষণাধীনে গভর্নর জেনারেল কোন আইন করিলে, তাহা ঘোষণা প্রত্যাহারের পরও দুই বৎসর পর্যন্ত বলবৎ থাকিতে পারিবে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় এসেম্ব্লি

ব্রিটিশ ভারতীয় প্রতিনিধিবৃন্দ

প্রদেশ	মোট সভ্যপদ	সাধারণ সভ্যের মোট সংখ্যা	তপশীল-ভুক্ত জাতিদের জন্য সংরক্ষিত সভ্যপদ	শিখ সভ্য-পদ	মুসলমান সভ্যপদ	অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সভ্যপদ	ইউরোপীয় সভ্যপদ	ভারতীয় খ্রীষ্টান সভ্যপদ	শিল্প ও বাণিজ্যের সভ্যপদ	জমিদার সভ্যপদ	শ্রমিক সভ্যপদ	স্ত্রীলোকের সভ্যপদ
মাদ্রাজ	৩৭	১৯	৪	—	৮	১		২	২	১	১	২
বোম্বাই	৩০	১৩	২	—	৬	১	১	১	৩	১	২	২
বাঙ্গলা	৩৭	১	৩	—	১৭	১	১	১	৩	১	২	১
যুক্তপ্রদেশ	৩৭	১৯	৩	—	১২	১	১	১	—	১	১	১
পাঞ্জাব	৩০	৬	১	৬	১৪	—	১	১	—	১	—	১
বিহার	৩০	১৬	২	—	৯	—	১	১	—	১	১	১
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১৫	৯	২	—	৩	—	—	—	—	১	১	১
আসাম	১০	৪	১	—	৩	—	১	১	—	—	১	—
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৫	১	—	—	৪	—	—	—	—	—	—	—
উড়িষ্যা	৫	৪	১	—	১	—	—	—	—	—	—	—
সিন্ধু	৫	১	—	—	৩	—	—	—	—	—	—	—
ব্রিটিশ বেলুচিস্থান	১	—	—	—	১	—	১	—	—	—	—	—
দিল্লী	২	১	—	—	১	—	—	—	—		—	—
আজমীর-মাড়ওয়ার	১	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
কুর্গ	১	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
নিখিল ভারতীয় সভ্যপদ	৪	—	—	—	—	—	—	—	৩	—	১	—
মোট	২৫০	১০৫	১৯	৬	৮২	৪	৮	৮	১১	৭	১০	৯

কাউন্সিল-অফ্-স্টেট্

ব্রিটিশ-ভারতীয় প্রতিনিধিবৃন্দ

প্রদেশ বা সম্প্রদায়	মোট সভ্যপদ	সাধারণ সভ্যপদ	তপশীল ভুক্ত জাতিদের প্রতি-নিধি	শিখ সভ্যপদ	মুসলমান সভ্যপদ	স্ত্রীলোক-দিগের সভ্যপদ
মাদ্রাজ	২০	১৪	১	—	৪	১
বোম্বাই	১৬	১০	১	—	৪	১
বাঙলা	২০	৮	১	—	১০	১
যুক্তপ্রদেশ	২০	১১	১	—	৭	১
পাঞ্জাব	১৬	৩	—	৪	৮	১
বিহার	১৬	১০	১	—	৪	১
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৮	৬	১	—	১	—
আসাম	৫	৩	—	—	২	—
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৫	১	—	—	৪	—
উড়িষ্যা	৫	৪	—	—	১	—
সিন্ধু	৫	২	—	—	৩	—
ব্রিটিশ বেলুচিস্থান	১	—	—	—	১	—
	১	১	—	—	.	—
আজমীর-মাড়ওয়ার	১	১	—	—	—	—
কুর্গ	১	১	—	—	—	—
অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান	১	—	—	—	—	—
ইউরোপীয়	৭	—	—	—	—	—
ভারতীয় খ্রীষ্টান	২	—	—	—	—	—
মোট	১৫০	৭৫	৬	৪	৪৯	৬

পরিশিষ্ট

(ক) আইন-অধিকারের কর্তৃত্ব-বিভাগ

ভারত-শাসন আইনে কোন্ কোন্ বিষয় যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভার অধীনে থাকিবে এবং কোন্ কোন্ বিষয় প্রাদেশিক আইন-সভার অধীনে থাকিবে তাহা সুনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মোট ৫৯টি বিষয়ে মাত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভাই আইন করিতে পারিবে—ব্রিটিশ প্রদেশ-সমূহ এই ৫৯টি বিষয়ে আইন করিতে পারিবে না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রান্তর্গত দেশীয় করদ ও মিত্ররাজ্যসমূহ এই বিষয়গুলির কোন কোনটিতে আইন করিবার ক্ষমতা নিজ অধিকারে রাখিয়া দিতে পারিবে। (Seventh Schedule, Government of India Act, 1935)

যুক্তরাষ্ট্রান্তর্গত বিষয়—

(১) ভারত সরকারের ব্যয়ে রক্ষিত সম্রাটের জল, স্থল ও বিমান-বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় গুপ্তচর বিভাগ ; দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে সম্রাটের দায়িত্ব পালন ; (২) জল, স্থল ও বিমানবাহিনী সংক্রান্ত কার্য, ব্রিটিশ ভারতীয় সৈন্যাবাস এলাকার স্বায়ত্তশাসন ও গৃহাদি নির্মাণ কার্যের নিয়ন্ত্রণ ; (৩) বৈদেশিক ব্যাপার, বিদেশের সঙ্গে সন্ধি সর্ত রক্ষা ও বিদেশী পলাতকের বিচারার্থ তাহাকে স্বদেশীয় গভর্নমেণ্টের নিকট প্রেরণ ব্যবস্থা ; (৪) যাজকীয় কার্য ও ইউরোপীয় কবরখানা ; (৫) মুদ্রাদি বিষয়ক কার্য ; (৬) যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ ; (৭) পোস্ট্ ও টেলিগ্রাফ, পোস্ট অফিস, সেভিঙ্স্ ব্যাঙ্ক, টেলিফোন, বেতার (wireless) ও ব্রড্কাস্টিং ইত্যাদি ; (৮) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের চাকুরি ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারি চাকুরি কমিশন ; (৯) যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক অথবা যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব হইতে দেয় পেন্শন্ ; (১০) যুক্তরাষ্ট্রীয় কার্যের নিমিত্ত সম্রাটের অধিকারে ন্যস্ত

কারখানা, জমি এবং ঘরবাড়ি; (১১) ইম্পিরিয়াল্ লাইব্রেরি, ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়াম,ইম্পিরিয়াল্ ওয়ার্ মিউজিয়াম্, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল্ এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থে পরিপুষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান; (১২) যুক্তরাষ্ট্রীয় গবেষণনাগার, ব্যবসা ও অন্যান্য বিশেষ কোন বিষয়ে শিক্ষার প্রতিষ্ঠান; (১৩) বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও আলিগড় মুস্লিম্ বিশ্ববিদ্যালয়; (১৪) ভারতীয় জমি-পরিভাগ (Survey of India), ভূ-তত্ত্ব, উদ্ভিদ-তত্ত্ব, জান্তব-তত্ত্ববিভাগ এবং যুক্তষ্ট্রীয় আবহাওয়া সম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ; (১৫) প্রাচীন ও ঐতিহাসিক স্মৃতি-স্তম্ভ, ভাস্কর্য, ঐতিহাসিক গৌরবযুক্ত স্থান ও প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ; (১৬) আদমসুমারি বা লোকগণনা; (১৭) ব্রিটিশ-ভারতের বা যুক্তরাষ্ট্রীয় কোন রাজ্যের অথবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রজা নহে অথচ ভারতের অধিবাসী এমন কোন লোকের ভারতে প্রবেশ অথবা বহিষ্করণ ও বহির্গমন; (১৮) সংক্রামক রোগ নিবারণার্থ বন্দরে উপাগত জাহাজের নগরের সহিত যোগাযোগ নিবারণ; নাবিক হাস-পাতাল ও যোগাযোগ-নিষিদ্ধ জাহাজের হাসপাতাল; (১৯) আমদানি শুল্ক ধার্যার্থে নির্ধারিত সীমার ভিতর আমদানি ও রপ্তানি; (২০) যুক্তরাষ্ট্রীয় রেলপথ, রেলপথের নিরাপত্তা, উচ্চতম ও নিম্নতম ভাড়া ও মাশুলের হার, মাল ও যাত্রীবাহী হিসাবে দায়িত্ব ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেলপথ সম্পর্কে নিরাপত্তা, মাল ও যাত্রীবাহীরূপে পরি-চালনার দায়িত্ব নিয়ন্ত্রণ; (২১) সমুদ্রপথে যানবাহনের চলাচলের ব্যবস্থাদি; সামুদ্রিক সীমানায় বিরোধের বিচার; (২২) প্রধান বন্দর-সমূহ, এই বন্দর কর্তৃপক্ষের সংগঠন ও ক্ষমতা ইত্যাদি; (২৩) রাষ্ট্রসীমার বাহির সমুদ্রে মৎস্য শিকার; (২৪) বিমানপোত ও তাহার চালনা, বিমানপোতাশ্রয়ের ব্যবস্থা ও তাহার নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি; (২৫) জাহাজ ও বিমানপোতাদি চলাচলের সুবিধার জন্য বাতিঘর (Light-house) ইত্যাদির ব্যবস্থা; (২৬) জলপথে ও আকাশপথে যাত্রী ও মালপত্র

বহন ; (২৭) স্বত্ব সংরক্ষণ, আবিষ্কার, নক্সা, ট্রেড মার্ক্ ও মালের চিহ্ন ; (২৮) হুণ্ডি, বিনিময় পত্র (Bill of Exchange), হাত চিঠা ও এই জাতীয় জিনিস ; (২৯) অস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলা বারুদ ; (৩০) বিস্ফোরক ; (৩১) আফিমের চাষ, প্রস্তুত করণ ও রপ্তানির জন্য বিক্রয় ; (৩২) যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনে বিপজ্জনক ভাবে দাহ্য বলিয়া নিদিষ্ট পেট্রোলিয়াম্ ও এই জাতীয় অন্যান্য দ্রব পদার্থের মালিকানা, মজুত ও চালান ; (৩৩) বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, নিয়ন্ত্রণ ও গুটান, (যুক্তরাষ্ট্রান্তর্গত দেশীয় বা করদ রাজ্যের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও সমবায় সমিতিসমূহ বাদে) ; (৩৪) যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন যে সকল নিল্প জনহিতার্থে যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন হওয়া উচিত বলিয়া নির্দেশ করে তাহার সাধন ; (৩৫) সাধারণ খনি ও তেলের খনির শ্রমিকদের সম্পর্কে আইন এবং নিরপত্তা বিধান ; (৩৬) যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন অনুসারে জনস্বার্থে সাধারণ খনি ও তেলের খনি এবং খনিজ পদার্থের উপর যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ; (৩৭) বীমা আইন—বীমা ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ইত্যাদি (যুক্তরাষ্ট্রান্তর্গত দেশীয় ও করদ রাজ্যসমূহের বীমা ব্যবসায়, যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রদেশ বা যুগ্ম অধিকারের এলাকাভুক্ত বীমা বাদে) ; (৩৮) ব্যাঙ্কিং—দেশীয় করদ বা মিত্ররাজ্য পরিচালিত ব্যাঙ্ক ব্যতীত ; (৩৯) পুলিস বিভাগের কর্মচারির ক্ষমতা, এক প্রদেশ হইতে অপর প্রদেশে ও রেলওয়ে পুলিসের ক্ষমতা এক প্রদেশে বা রাজ্য হইতে অন্যতে সম্প্রসারিত করা ; (৪০) যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভার নির্বাচন ; (৪১) যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলীর বেতন, রাষ্ট্র-পরিষদের সভাপতি ও সহকারী সভাপতি এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় এসেম্ব্লির সভাপতি ও সহকারী সভাপতির বেতন, যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভাদ্বয়ের সভ্যদের বেতনাদি, আইন-সভার কমিটির নিকট সাক্ষ্যাদি দিতে অস্বীকৃত ব্যক্তিবর্গের শাস্তির ব্যবস্থা ; (৪২) এই তালিকার বিষয়ভুক্ত আইন অমান্যের অপরাধ ; (৪৩) এই তালিকাভুক্ত

যে কোন বিষয়ের অনুসন্ধান ও হিসাব; (৪৪) রপ্তানি শুল্ক সমেত কাস্টম্ শুল্ক; (৪৫) মদ, আফিম, গাঁজা ও অপরাপর অবসাদক দ্রব্য, মাদক দ্রব্যযুক্ত বা মাদক দ্রব্য বর্জিত ঔষধাদি এবং মাদক দ্রব্যযুক্ত প্রসাধন সামগ্রী ব্যতীত তামাক ও ভারতে উৎপন্ন অন্য দ্রব্যের উপর আবগারি ট্যাক্স্; (৪৬) কর্পোরেশন্ বা সম্মিলিত কারবারের উপর ট্যাক্স; (৪৭) লবণ; (৪৮) সরকার অনুষ্ঠিত লটারি; (৪৯) প্রজাধিকার লাভ (naturalisation); (৫০) ভারতের এক প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্য প্রদেশে অধিবাস করা; (৫১) ওজনের মাত্রা ধার্য; (৫২) রাঁচির ইউরোপীয় পাগলা হাসপাতাল; (৫৩) এই তালিকার যে কোন বিষয় সম্বন্ধে ফেডারেল কোর্ট ব্যতীত অন্যান্য সকল কোর্টের ক্ষমতা, ফেডারেল কোর্টের আপীল ক্ষমতা বৃদ্ধি; (৫৪) কৃষির আয় ব্যতীত অন্য আয়ের উপর আয়কর; (৫৫) কৃষিজমি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির মূল্যানুপাতে কর ধার্য, ব্যবসায়ের মূলধনের উপর কর, কোম্পানির মূলধনের উপর ট্যাক্স্; (৫৬) কৃষির জমি ব্যতীত অন্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারের উপর কর; (৫৭) বিনিময়-পত্র, চেক্, হাত চিটা, বিল্ অফ্ লেডিং লেটার্স অফ ক্রেডিট্, ইন্সিওরেন্স্ পলিসি ইত্যাদির স্ট্যাম্প্ ডিউটির হার; (৫৮) রেলওয়ে বা আকাশপথে বাহিত মাল ও যাত্রীর উপর টার্মিন্যাল ট্যাক্স্, রেলওয়ে ভাড়ার উপর ট্যাক্স্ (৫৯) কোন আদালতে গৃহীত ফি বাদে এই তালিকাভুক্ত যে কোন বিষয় সম্বন্ধে ট্যাক্স্।

যুগ্মাধিকারের বিষয়—সর্বশুদ্ধ ৩৬টি নির্দিষ্ট বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও প্রদেশ উভয়েরই ক্ষমতা বর্তমান; ইহাদের কোনটিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন প্রাদেশিক আইন বিরোধী হইলে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনই বলবৎ হইবে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় করদ ও মিত্র রাজ্যসমূহ যুক্তরাষ্ট্রকে তাহাদের সম্বন্ধে এই সকল বিষয়ের কোন কোনটিতে আইন করিবার ক্ষমতা না দিয়া সম্পূর্ণ নিজ অধিকারে রাখিতে পারে। উপরোক্ত ৩৬টি বিষয় এই :—(১) যুক্তরাষ্ট্রীয়

ও প্রাদেশিক তালিকাভুক্ত আইনের বিরুদ্ধাচরণ এবং অসামরিক কার্যে সম্রাটের সৈন্যবাহিনী ব্যবহার ব্যতীত ভারতীয় দণ্ডবিধির অন্তর্গত বিষয়সকল সহ ফৌজদারি আইন; (২) ফৌজদারি কার্যবিধি ও তদন্তর্গত সমস্ত ব্যাপার; (৩) এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে বন্দী ও বিচারাধীন ব্যক্তিদিগকে চালান দেওয়া; (৪) এই আইন পাশ হওয়ার সময় পর্যন্ত দেওয়ানি কার্যবিধির অন্তর্গত সকল বিষয়ের আইন; গভর্নর বা চীফ্ কমিশনারের অধীন প্রদেশসমূহের ট্যাক্স্ ও অন্যান্য সরকার পাওনা আদায়ের ব্যবস্থা; বাকি ভূমি রাজস্ব সহ ট্যাক্সাদি ও অপর সরকারি দাবী আদায়; (৫) সাক্ষ্য ও শপথ, আইন এবং বিচার-প্রণালী স্বীকার করা; (৬) বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ, শিশু, নাবালক ও দত্তকগ্রহণ; (৭) কৃষিভূমি ব্যতীত অন্য সম্পত্তির দানপত্র ও উত্তরাধিকার; (৮) কৃষিভূমি ব্যতীত অন্য সম্পত্তির হস্তান্তর, দলিল-পত্রাদির রেজিস্ট্রেশন্; (৯) ট্রাস্ট্ ও ট্রাস্টি; (১০) কৃষিভূমি ব্যতীত অপরাপর বিষয়ে চুক্তি (contract); (১১) আপোষ মীমাংসা; (১২) দেউলিয়া আইনানুমোদিত কার্য, অ্যাড্মিনিস্ট্রেটর জেনারেলগণ ও অফিসিয়াল ট্রাস্টী; (১৩) বিচার বিভাগীয় স্ট্যাম্প্ ব্যতীত অন্য স্ট্যাম্প্ ডিউটি; (১৪) যুক্তরাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক তালিকা অন্তর্গত বিষয়সমূহ ব্যতীত দণ্ডনীয় অপরাধ; (১৫) এই তালিকার কোন বিষয় সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ব্যতীত অন্য আদালতের বিচারাধিকার; (১৬) আইন, চিকিৎসা ও অন্য ব্যবসায়; (১৭) সংবাদপত্র, পুস্তক ও ছাপাখানা; (১৮) মস্তিষ্ক বিকৃতি ও তাহার চিকিৎসার স্থানাদি; (১৯) বিষ ও মারাত্মক ঔষধ; (২০) যন্ত্রচালিত যানাদি; (২১) বয়লার; (২২) পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণ; (২৩) এদেশবাসী ইউরোপীয় লোকদের বেকার ভ্রমণ, অপরাধ-প্রবণ উপজাতি; (২৪) এই তালিকার যে কোন বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও হিসাব; (২৫) কোর্ট কর্তৃক গৃহীত ফি ব্যতীত এই তালিকার পূর্বোক্ত ২৪টি বিষয় সম্বন্ধীয় ফি।

২য় ভাগ * :—

(২৬) কারখানা ; (২৭) শ্রমিক শ্রেণীর হিতসাধন, তাহাদের অবস্থা আলোচনা, প্রভিডেন্ট্ ফাণ্ড, মালিকের দায় ও শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ, স্বাস্থ্যবীমা (স্বাস্থ্যহানিজনিত বিকলাবস্থায় ও বার্ধক্যে পেন্‌শন সহ) ; (২৮) বেকার বীমা ; (২৯) ট্রেড্ ইউনিয়ন্ বা শ্রমিক-সঙ্ঘ শিল্প ও শ্রমিক সম্বন্ধীয় বিরোধ ; (৩০) মনুষ্য, জন্তু বা বৃক্ষাদি আক্রমণকারী সংক্রামক রোগের বিস্তারে বাধা প্রদান ও নিরোধ ; (৩১) বৈদ্যুতিক শক্তি ; (৩২) দেশের আভ্যন্তরীক জলপথে যন্ত্রচালিত জাহাজাদির চলাচল ও ঐ জলপথের নিয়ন্ত্রণ, আভ্যন্তরিক জলপথে যাত্রী ও মাল বহন ; (৩৩) সিনেমেটোগ্রাফ্ ফিল্‌ম সর্বসাধারণকে দেখাইবার অনুমতি ; (৩৪) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কর্তৃক আটককরা লোক ; (৩৫) এই তালিকার এই অংশের যে কোন বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও হিসাব ; (৩৬) কোর্ট-ফি বাদে এই তালিকার এই অংশের যে কোন বিষয় ফি ।

প্রাদেশিক অধিকারের বিষয়—সর্বসমেত ৫৪টি বিষয় সম্পূর্ণভাবে প্রাদেশিক সরকারের হাতেই রাখা হইয়াছে। ঐ বিষয়সমূহ এই :—

(১) দেশের সাধারণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা (অসামরিক কার্যে সৈন্যের ব্যবহার বাদে) ; বিচার ব্যবস্থা, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ব্যতীত সকল আদালতের গঠনাদি ও তাহাদের ফি ; সাধারণ শৃঙ্খলা রক্ষার্থে আটক ও ঐরূপ আটকাধীন ব্যক্তি ; (২) এই তালিকার কোন বিষয় সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ব্যতীত অন্য আদালতের অধিকার ও ক্ষমতা : খাজনা ও রাজস্ব কোর্টের কার্যবিধি ; (৩) পুলিস, (রেলওয়ে পুলিস ও গ্রাম্য চৌকিদার সহ) ; (৪) কারাগার, চরিত্র সংশোধনাগার ও অল্পবয়স্কদের

* এই দ্বিতীয় ভাগের বিষয়সমূহ সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভার কোন আইন কার্যকরী করিবার ভার যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারকে দিতে পারিব।

জন্য কারাগার এবং এই জাতীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানাদি, তথায় অবরুদ্ধ লোক, কারাগার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানাদির ব্যবহারার্থে ভিন্ন প্রদেশের সহিত বন্দোবস্ত করা ; (৫) প্রদেশের সরকারি ঋণ ; (৬) প্রাদেশিক সরকারি চাকুরি ও প্রাদেশিক সরকারি কর্মচারি নির্বাচন কমিশন ; (৭) প্রদেশ কর্তৃক বা প্রাদেশিক তহবিল হইতে দেয় পেন্‌শন্ ; (৮) প্রদেশের কাজের জন্য সম্রাটের হস্তে ন্যস্ত কারখানা, জমি বা ঘরবাড়ি ; (৯) বাধ্যতামূলক জমি গ্রহণ ; (১০) প্রদেশ কর্তৃক পরিচালিত এবং প্রাদেশিক অর্থে পুষ্ট পুস্তকাগার ও যাদুঘর প্রভৃতি ; (১১) প্রাদেশিক আইন-সভার নির্বাচন ; (১২) প্রাদেশিক মন্ত্রী, লেজিস্‌লেটিভ্ এসেম্ব্লির সভাপতি ও সহকারী সভাপতি এবং লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের সভাপতি ও সহকারী সভাপতির বেতন, প্রাদেশিক আইন-সভার সভ্যদের বেতন, ভাতা ও বিশেষ অধিকারাদি এবং প্রাদেশিক আইন-সভার কমিটির নিকট সাক্ষ্যাদি দেওয়ার অসম্মতিতে শাস্তিদান ; (১৩) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন অর্থাৎ মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন, ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট্, জেলাবোর্ড, খনি-অঞ্চল প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসন-মূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের গঠন ও তাহাদের ক্ষমতা ইত্যাদি ; (১৪) জনস্বাস্থ্য. হাসপাতাল ও ডিস্‌পেন্‌সারি ; জন্মমৃত্যুর তালিকা ; (১৫) ভারতের আভ্যন্তরীণ তীর্থযাত্রা ; (১৬) কবর ও কবরখানা ; (১৭) শিক্ষা ; (১৮) যাতায়াতের ব্যবস্থা অর্থাৎ রাস্তা, পুল, খেয়া ও যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকা বহির্ভূত অপরাপর গমনাগমন ব্যবস্থা, ক্ষুদ্রতর রেলওয়ে (এই সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রীয় অধিকার বাদে), মিউনিসিপ্যাল ট্রামপথ, শূন্যে দড়ির পোল, জলপথ ও যাতায়াত, এই বিষয়ে যুগ্ম অধিকারের বিষয় ব্যতীত), বন্দর (প্রধান বন্দর সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রীয় অধিকারের ক্ষেত্র ব্যতীত) যন্ত্রযান ব্যতীত, অন্যরূপ যান ; (১৯) জল অর্থাৎ জল সরবরাহ, জল-সেচ, খাল, নর্দমা, বাঁধ, জল সঞ্চয় ও জলবেগ ব্যবহার ; (২০) কৃষি, কৃষিশিক্ষা ও কৃষি-গবেষণা, বৃক্ষাদির পোকা ও

রোগ দূরীকরণ, গবাদি পশুর উন্নতি, পশুরোগ নিবারণ, পশু-চিকিৎসা, খোয়াড় ইত্যাদি ; (২১) ভূমি অর্থাৎ ভূমির স্বত্ব, ভূমির ভোগ দখলের ব্যবস্থা (land tenure) ও প্রজা-জমিদারের সম্বন্ধ এবং খাজানা আদায়, কৃষির জমি হস্তান্তর ও সম্পূর্ণ হস্তচ্যুত করা, জমির উন্নতি ও কৃষিবিষয়ক ঋণ, নূতন বসতি, কোর্ট-অফ-ওআর্ডস, দায়যুক্ত ও ক্রোককরা জমিদারি, গুপ্তধন ; (২২) বনভূমি ; (২৩) সাধারণ খনি ও তৈলের খনির নিয়ন্ত্রণ ও উন্নতির সাধন (এই বিষয় যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বাদে) ; (২৪) মৎস্য শীকারাদি ব্যবসা ; (২৫) বন্য পশুপক্ষী সংরক্ষণ ; (২৬) গ্যাস ও গ্যাসের কারখানা , (২৭) প্রদেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য, বাজার ও মেলা, ঋণদান ও ঋণদাতা ; (২৮) সরাইখানা ও তাহার পরিচালক ; (২৯) মাল উৎপাদন ও সরবরাহ, শিল্পোন্নতি (যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কতিপয় শিল্পের উন্নতির কার্য বাদে) ; (৩০) খাদ্য ও অন্য দ্রব্যাদির ভেজাল, ওজন ও পরিমাণ ; (৩১) মাদক দ্রব্যাদি অর্থাৎ মদ, আফিম ও অপর মাদকদ্রব্যযুক্ত পদার্থ প্রস্তুত, মজুত, চালান, ক্রয় ও বিক্রয় (আফিম সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রীয় অধিকার এবং বিষ ও বিপজ্জনক ঔষধ সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের যুগ্ম অধিকার ব্যতীত) ; (৩২) দরিদ্রের সাহায্য, বেকার-সমস্যা ; (৩৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় অধিকারভুক্ত প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসায়-গুটান ; কোম্পানি হিসাবে পরিচালিত নহে, এমন ব্যবসা, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও ধর্মাদি সম্বন্ধীয় সমিতি ; সমবায়-সমিতি ; (৩৪) দান ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান, দাতব্য ও ধর্মসম্বন্ধীয় দান ; (৩৫) নাটক, নাটক-অভিনয়, সিনেমা-প্রদর্শন (সিনেমা) মঞ্জুর বাদে, যুগ্মাধিকারের ৩৩ দফা দ্রষ্টব্য ; (৩৬) বাজিরাখা ও জুয়াখেলা ; (৩৭) এই তালিকাভুক্ত বিষয় সম্বন্ধীয় আইনের বিরুদ্ধাচরণ ; (৩৮) এই তালিকাভুক্ত যে কোন বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও গণনা ; (৩৯) ভূমি

রাজস্ব, রাজস্ব ধার্য ও আদায়, ভূস্বত্ব সম্পর্কে দলিলাদি ; রাজস্ববিষয়ক জরিপ এবং রাজস্বের হস্তান্তর ; (৪০) প্রদেশের ভিতরে উৎপন্ন নিম্নোক্ত দ্রব্যাদির উপর আবগারি ট্যাক্স এবং ভারতে অন্যান্য প্রদেশ হইতে আগত ঐরূপ দ্রব্যাদির উপর অনুরূপ ট্যাক্স :—মদ, আফিম, ভারতীয় গাঁজা ও অপর অবসাদক ঔষধ এবং উপরিউক্ত দ্রব্যাদিযুক্ত ডাক্তারিও প্রসাধন সামগ্রী ; (৪১) কৃষি-সংক্রান্ত আয়ের উপর ট্যাক্স ; (৪২) ভূমি, বাড়ি, জানালা প্রভৃতির উপর ট্যাক্স ; (৪৩) কৃষি-জমির উত্তরাধিকারের উপর ট্যাক্স ; (৪৪) (খনি সম্বন্ধীয় উন্নতি বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভার আইন সাপেক্ষ) খনির সম্পত্তির উপর ট্যাক্স ; (৪৫) মাথাপিছু কর (capitation tax) ; (৪৬) ডাক্তারি, ওকালতি ইত্যাদি পেশা, বাণিজ্য ও চাকুরির উপর ট্যাক্স ; (৪৭) প্রাণী ও নৌকার উপর ট্যাক্স ; (৪৮) মাল বিক্রয় ও বিজ্ঞাপনের উপর ট্যাক্স ; (৪৯) স্থান বিশেষে কোন জিনিস বিক্রয় ও ব্যবহারের নিমিত্ত আসিলে তাহার উপর ট্যাক্স ; (৫০) বিলাসদ্রব্যের উপর ট্যাক্স ; (আমোদ-প্রমোদ, বাজি ও জুয়াখেলার ট্যাক্স সহ) ; (৫১) যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য বৈষয়িক দলিল-পত্রাদির স্ট্যাম্পের হার ; (৫২) আভ্যন্তরীণ জলপথে চালিত মাল ও যাত্রীর উপর কর ; (৫৩) বিক্রয়ার্থ আনীত দ্রব্যের উপর কর (tolls) ; (৫৪) কোর্ট-ফি বাদে এই তালিকার যে কোন বিষয় সম্বন্ধে ফি।

(খ) ভারত-রক্ষার ব্যবস্থা

সামরিক বিভাগ ও সেনাবল—বৈদেশিক আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবার সম্পূর্ণ ভার রহিয়াছে ব্রিটিশ সরকারের হাতে। বর্তমানে ভারত-রক্ষার জন্য যে সকল সৈন্যসামন্ত নিযুক্ত আছে, তাহাদিগকে (১) স্থল-বাহিনী, (২) নৌ-বাহিনী ও (৩) বিমান-বাহিনী—

এই তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে স্থল-বাহিনীই সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সর্বপ্রধান। ইহারা আবার নিম্নোক্ত ছয়টি বিভাগ লইয়া গঠিত :—

(১) ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ব্রিটিশ সৈন্য ও সেনানী (Units of the British Army);

(২) ইংরেজ সহকারী সেনা (The Auxiliary Force):

(৩) ভারতীয় সহকারী সেনা বা স্থানীয় সেনাদল (The Indian Territorial Force);

(৪) ভারতীয় রিজার্ভ সৈন্যদল (Indian Reservists);

(৫) দেশীয় করদ ও মিত্র রাজ্যের সেনাবাহিনী (Indian States Forces)। ভারত সরকার প্রয়োজন মত দেশীয় রাজ্যের এই সৈন্যবাহিনীকে নিজকার্যে নিযোগ করিতে পারেন।

ভারতীয় নৌবহরের পাঁচখানা যুদ্ধ জাহাজ লইয়া মোট ১৮ খানি জাহাজ আছে; এবং বিমানবাহিনীতে নিযুক্ত বিমানপোতের সংখ্যা ১৯৬টি।

বর্তমান যুদ্ধের পূর্বে ভারত-রক্ষার জন্য স্থল, জল ও বিমান বাহিনীতে সর্বসমেত প্রায় ২,৬০,০০০ লোক ছিল। ইহাদের মধ্যে ব্রিটিশ সেনা ও সেনানীর সংখ্যা ছিল মোট ৬৭,০০০। ভারতীয় নৌবহরে ১৬৭ জন উচ্চ পদস্থ কর্মচারি (officer) ও ইঞ্জিনিয়ার এবং সহস্র নাবিক ছিল। বিমান-বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মচারির সংখ্যা ছিল মাত্র ১৬০ জন এবং অন্যান্য লোকের সংখ্যা ৯৬০ জন।

যুদ্ধের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সর্বদিক দিয়াই দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। পাঁচ লক্ষ সেনানীর বাহিনী গঠন সরকারের অদূর লক্ষ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। নূতন সেনানী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারিদের শিক্ষারও প্রসার ঘটিয়াছে। পাঁচ হাজারের স্থলে ৩২ হাজার মোটরযান

ব্যবহৃত হইতেছে এবং ইহা দ্বিগুণ করিবার চেষ্টা চলিতেছে। প্রায় ৬০ হাজার লোক ভারতের বাহিরে যুদ্ধকার্যে গিয়াছে।

নানাদিক দিয়া যুদ্ধ সরবরাহ কার্যে ভারতবর্ষ আপন ও ব্রিটেনের সাহায্যার্থ শিল্প সম্ভাব প্রস্তুত করিতেছে। এই উদ্দেশ্যে একটি বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা বোর্ড (Scientific and Industrial Research Board) বিখ্যাত পাঞ্জাবী বৈজ্ঞানিক সার্ এস্. আর্. ভাটনগরের অধীনে গঠিত হইয়াছে।

নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা—গভর্নর জেনারেলের উপরেই ভারত-রক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে। অবশ্য, তিনি অন্যান্য বিষয়ের মত, ভারত-রক্ষার জন্যও ভারত-সচিবের নিকট দায়ী। পূর্বে ভারতের সেনাবিভাগের ব্যয় ও সামরিক নীতির উপর বড়লাটের শাসন পরিষদের যে কর্তৃত্ব ছিল, বর্তমান ভারত-শাসন আইনে তাহা যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলীর উপরে ন্যস্ত করা হয় নাই। ভারত রক্ষা সম্পর্কে ভারত-সচিব ও গভর্নর জেনারেলের পরেই প্রধান সেনাপতির (Commander-in-Chief) দায়িত্ব ও ক্ষমতা রহিয়াছে। পূর্বে প্রধান সেনাপতি গভর্নর জেনারেলের কার্যকরী সভার বিশিষ্ট সভ্যরূপে সামরিক নীতি নিয়ন্ত্রণ করিতেন এবং কার্যক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনাও করিতেন। নূতন বিধানে কিন্তু তিনি আর সামরিক নীতি পরিচালনা করিতে পারিবেন না। অতঃপর ভারত-সচিবের নির্দেশাধীনে গভর্নর জেনারেল একাই সামরিক নীতি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করিবেন। তবে, কার্যক্ষেত্রে সৈন্য-পরিচালন ভার প্রধান সেনাপতির হাতেই রহিয়াছে। ইহা ছাড়া, রাজোপদেশ-লিপিতে উক্ত হইয়াছে যে, দেশরক্ষা বিভাগ পরিচালনে প্রধান সেনাপতির কর্তব্যসংশ্লিষ্ট ব্যাপারে গভর্নর জেনারেল প্রধান সেনাপতির মতামত গ্রহণ করিবেন এবং প্রধান সেনাপতির অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহার ঐ মত ভারত-সচিবকে জানাইবেন।

যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনের পরে, নূতন আইন অনুসারে, গভর্নর জেনারেলের মতই প্রধান সেনাপতির নিয়োগ, বেতন প্রভৃতিও রাজনির্দেশে স্থির হইবে।

রাজোপদেশ-লিপিতে আরও বলা হইয়াছে যে দেশরক্ষা ক্রমশ ভারতীয়দেরই কার্য হইয়া দাঁড়াইবে। তাই, এই বিষয়ে গভর্নর জেনারেল তাঁহার মন্ত্রী, উপদেষ্টা ও নিজের মধ্যে যুক্ত আলোচনা উৎসাহিত করিবেন; এবং সম্রাটের ভারতীয় সৈন্যদলে ভারতীয় উচ্চ কর্মচারি নিয়োগ বা ঐ সৈন্য ভারতের বাহিরে ব্যবহার সম্বন্ধে মন্ত্রীদের অভিমত জানিবেন।

সামরিক ব্যয়—ব্রিটিশ সরকারের অন্যান্য উপনিবেশের তুলনায় ভারতের সামরিক ব্যয় অনেক বেশি। ভারত সরকারের মোট যে পরিমাণ অর্থ বাৎসরিক ব্যয় হইয়া থাকে, সাধারণত তাহার অর্ধেকেরও বেশি ব্যয় হয় দেশরক্ষা বিভাগের জন্য। *

হিসাবে দেখা যায়, বৎসরে প্রতি ব্রিটিশ সৈন্যের জন্য ৯,২৩৭ টাকা খরচ হয়, কিন্তু প্রতি ভারতীয় সৈন্যের জন্য খরচ হয় মাত্র ৪৩৩ টাকা।

ভারতের উপকূল রক্ষার বিনিময়ে ভারত সরকার ব্রিটিশ সরকারকে বৎসরে ১ লক্ষ পাউণ্ড দিয়া থাকেন। নৌ-বাহিনী ও বিমান-বাহিনীর জন্য ভারত সরকারের যথাক্রমে ৭৭ লক্ষ ও ১ কোটি টাকা বাৎসরিক ব্যয় হয়।

ব্রিটিশ সরকার সময় সময় ভারতের বাহিরেও ভারতীয় সৈন্যের সাহায্য লইয়া থাকেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীকে আবার সর্বদাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। তাই, ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় সেনাদলের ব্যয় বাবদ বৎসরে ১৫ লক্ষ পাউণ্ড দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিছুদিন

* ১৯৩৯-৪০ সনের ভারত সরকারের আয়ব্যয়ের হিসাবে ব্যয়ের পরিমাণ ৮১,৬৫ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৪৫,১৮ লক্ষ টাকা ভারত-রক্ষার জন্য ব্যয়িত হইবে।

পূর্বে ৪টি ব্রিটিশ সৈন্যবিভাগ যন্ত্র-যানবাহনসম্পন্ন (mechanised) করার জন্য ব্রিটিশ সরকার আংশিক সাহায্য হিসাবে ২১৫ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ের মধ্যে মাত্র ৮০ লক্ষ দিতে রাজী হইয়াছেন। যুদ্ধের পর এ বিষয়ে ভারত-সরকারকে আরও অর্থ সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

সেনাদলে ভারতীয় নিয়োগ—ভারতীয় সেনাবিভাগে ভারতবাসী নিয়োগের জন্য বহুদিন হইতেই প্রস্তাব ও আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। গত ইউরোপীয় যুদ্ধে ভারতীয় সেনাগণ সত্যই সন্তোষজনক কার্য করিয়াছিল। ব্রিটিশ সরকারও ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ভারতীয় সেনাদলে ভারতীয় নিয়োগের পরামর্শ দেন। গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব অনুসারে ভারতীয় সেনাবিভাগে ক্রম-বর্ধিত হারে ভারতবাসী নিয়োগের জন্য ১৯৩১ সনে এক পরিকল্পনা হয়। একটি সম্পূর্ণ বিভাগের পদাতিক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ প্রভৃতি সকল অংশই কেবলমাত্র ভারতীয় সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষ লইয়া গঠন করাই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। ১৯৫২ সনের মধ্যেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার প্রস্তাব ছিল।

১৯৩২ সালে দেরাদুনে ভারতীয় সামরিক শিক্ষায়তন (Indian Military Academy) নামে একটি সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কেবল ১৮ হইতে ২০ বৎসর বয়স্ক ভারতীয় যুবকদিগকেই এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই শিক্ষায়তনে প্রতি বৎসর ১৬০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়; শিক্ষাকাল মাত্র আড়াই বৎসর। এই স্থানে সর্বপ্রথম যে ছাত্রগণ শিক্ষা পাইয়াছিল, তাহারা ১৯৩৫ সনে রাজকীয় কমিশন (King's Commission)-রূপ উচ্চতম শ্রেণীর সেনাপতিত্ব লাভ করিয়াছে।

ইহা ছাড়া, ইংল্যাণ্ডের ক্র্যান্‌ওয়েল্‌ রাজকীয় ব্যোমসৈন্য কলেজেও (Cranwell Air Force College) বৎসরে ১০ জন ভারতীয়কে বিমান চালনা শিক্ষার্থ পাঠান হইয়া থাকে। ভারতীয় নৌবহরে নিযুক্ত কর্মচারী

ও নাবিকগণের মধ্যে ⅓ অংশ ভারতীয়দের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য ভারতীয় সৈন্যবিভাগে অধিক সংখ্যক ভারতীয় নিয়োগের পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য দ্রুততর গতিতে আরম্ভ হইয়াছে।

চ্যাট্‌ফিল্ড্‌ কমিটি—আজিকার এই যুদ্ধ বিগ্রহের দিনে ভারত ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরপত্তার জন্য ভারতে আধুনিক সমরোপকরণে সজ্জিত সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার মোটেই উদাসীন রহেন নাই। ১৯৩৮ সালে ব্রিটিশ সরকার যে চ্যাট্‌ফিল্ড কমিটি (Chatfield Committee) নিয়োগ করেন, ভারতে অবস্থিত সেনা-বাহিনীকে আধুনিক সমরোপকরণে সজ্জিত করিবার উদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পনা রচনাই ছিল তাহার কর্তব্য। এই কমিটির পরিকল্পনা অনুসারে ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য আধুনিক রণসম্ভার জোগাইতে ৪৫ কোটি টাকার প্রয়োজন হইবে। এই ৪৫ কোটি টাকার মধ্যে ব্রিটিশ সরকার ৩৩¾ কোটি টাকা ভারত-সরকারকে দান করিবেন এবং বাকি ১১¼ কোটি ঋণ দিবেন। প্রথম পাঁচ বৎসর এই ঋণের বাবদ কোন সুদ দিতে হইবে না। কিন্তু তাহার পর এই ১১¼ কোটি টাকা বাৎসরিক কিস্তিতে সুদ সমেত ভারত-সরকারের তহবিল হইতে পরিশোধ করিতে হইবে। উপরিউক্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ব্রিটিশ সরকার ভারতে অবস্থিত সেনাবাহিনীর ব্যয় বাবদ বৎসরে ১৫ লক্ষ পাউণ্ডের স্থলে ২০ লক্ষ পাউণ্ড দিতে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু ভবিষ্যতে ভারত রক্ষার জন্য ব্রিটিশ সরকার ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ ও ভারতীয় সৈন্য বিদেশে প্রেরণ করিলে ঐ সৈন্যদের সাধারণ ব্যয়সমূহ ভারতীয় তহবিল হইতেই দিতে হইবে। তাই, ১৯৩৮ সালের ১লা জুলাই ভারতীয় সেনাদলে যত ব্রিটিশ সৈন্য ছিল, তাহাদের মধ্যে শতকরা ২৫ জন ভারতীয় সেনাবাহিনী হইতে অপসারিত করিবার প্রস্তাব হয়।

চ্যাট্‌ফিল্ড্‌ কমিটির প্রস্তাবানুসারে ও পরে যুদ্ধারম্ভে ভারত রক্ষার

জন্য স্থল, জল ও বিমানবাহিনীকে বর্তমানকালের যুদ্ধোপযোগী করিবার সর্ববিধ আয়োজনই চলিতেছে। ভারতে যাহাতে যাবতীয় সমরোপকরণ প্রস্তুত হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে এদেশে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-বারুদের কারখানাগুলির (ordnance factories) সংস্কার, প্রসার এবং উন্নতির ব্যবস্থাও হইয়াছে। এই শ্রেণীর নূতন কারখানাও প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

চ্যাট্‌ফিল্ড কমিটিতে ভারতীয়দের মধ্য হইতে কোন সভ্য লওয়া হয় নাই। ইহাতে ভারতে বিক্ষোভ দেখা দেয়। ইহা ছাড়া, ভারত-রক্ষার ব্যবস্থায় ভারতবাসীদের যে সুযোগ ও অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহাও তাহাদের আশানুরূপ নহে।

(গ) যুদ্ধ ও ভারতের শাসন-ব্যবস্থা

দেশরক্ষা (Defence) অন্যতম সংরক্ষিত বিষয়। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে ভারত রক্ষার দায়িত্ব ও পূর্ণ কর্তৃত্ব গভর্নর জেনারেলের হাতে অর্পিত হইয়াছে। সমস্ত রাষ্ট্রেই যুদ্ধের সময় জরুরী সামরিক ব্যবস্থা ও দায়িত্ব কেন্দ্রীভূত করা হয়। এতদুদ্দেশ্যে পার্লামেণ্ট ১৯৩৯ সালে ভারত-শাসন আইনের সংশোধন করিয়াছেন। এই সংশোধন দ্বারা বহিঃশত্রু কর্তৃক ভারতবর্ষ আক্রান্ত হইলে বা সেরূপ কোন আশঙ্কা থাকিলে, পূর্বের মত সমগ্র ভারতের যাবতীয় শাসন-ক্ষমতা গভর্নর-জেনারেলের হাতে অর্পণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। যেমন শাসন-যন্ত্র অচল হইলে গভর্নর জেনারেলের প্রয়োজনমত ভারত-শাসন-ভার নিজের হাতে গ্রহণ করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে, উপরিউক্ত সংশোধন অনুসারেও তাঁহাকে অনুরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন কিছুটা ক্ষুণ্ণ হইলেও, সমগ্র ভারতের নিরাপত্তার জন্য সামরিক

ও জরুরী ব্যবস্থার এই বিধান অপরিহার্য বলিয়া ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জার্মেনী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে, পোল্যাণ্ডের মিত্র হিসাবে ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্স জার্মেনীর বিরুদ্ধে ঐ সময়ে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তখন গভর্নর জেনারেল লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো পোল্যাণ্ড —তথা ইয়োরোপে গণতন্ত্র ও মানবীয় স্বাধীনতা—রক্ষার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যের কাছে এই যুদ্ধে সর্ববিধ সহযোগিতা ও সাহায্যের জন্য আবেদন জানান। যুদ্ধ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের মতামত গ্রহণ না করিয়াই ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে জার্মেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত দেশ বলিয়া ঘোষণা করেন। ভারত-সরকার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি অর্ডিন্যান্সও জারী করেন; বলা বাহুল্য ইহাতে ব্যক্তি স্বাধীনতা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয় এবং প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের স্বাতন্ত্র্যের উপরও হস্তক্ষেপের আশঙ্কা অনুভূত হয়। ইহাতে ভারতে এক বিক্ষোভের সূচনা হয়।

এই সময়ে নিখিল ভারত জাতীয় রাষ্ট্র-মহাসভা (Indian National Congress) ভারতের পক্ষ হইতে ব্রিটিশ সরকারকে ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহাদের মনোভাব সুস্পষ্টরূপে জানাইতে অনুরোধ করেন। যে গণতন্ত্র ও মানবীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এই যুদ্ধ, ভারতেও সেই গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতা অবিলম্বে প্রতিষ্ঠিত হইবে, এরূপ প্রতিশ্রুতি না পাইলে ভারতবর্ষ এই যুদ্ধে যোগদান করিবে না—একথাও রাষ্ট্র-মহাসভা উল্লেখ করেন। এই বিবৃতিতে ভারতের জনসাধারণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত গণ পরিষদের মতানুকুল এক গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনার অধিকার দাবী করা হয়। ইহা ছাড়া, অবিলম্বে যথাসম্ভব প্রকৃত গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবীও এই প্রসঙ্গে উত্থাপিত হয়।

ইহার পর গভর্নর জেনারেল মহাত্মা গান্ধি, পণ্ডিত জওহরলাল

নেহ্‌রু, মিঃ জিন্না প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের সহিত যুদ্ধে ভারতীয়দের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই আলোচনার পর গভর্নর জেনারেল হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হইলে ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করা অসম্ভব বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

মহাত্মা গান্ধি ও মিঃ জিন্না সাম্প্রদায়িক সমস্যার আলোচনার পর
(নভেম্বর ১৯৩৯)

এই আলাপ-আলোচনার ফলে লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো ব্রিটিশ সরকারের অনুমতিক্রমে এক ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় বলা হয় যে, যুদ্ধ অবসান হইলে ব্রিটিশ সরকার ভারত-শাসনের যথাসম্ভব সংস্কার

সাধনের উদ্দেশ্যে বিটিশ ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট দলের প্রতিনিধি এবং দেশীয় রাজ্যের নৃপতিদের লইয়া আর একটি আলোচনা বৈঠক আহ্বান করিতে সম্মত আছেন। ইহা ছাড়া, গভর্নর জেনারেল অনতিবিলম্বেই ব্রিটিশ ভারতের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ এবং দেশীয় নৃপতিদের প্রতিনিধি লইয়া এক সাময়িক পরামর্শ সভা (consultative group) গঠনেরও প্রস্তাব করেন। ভারতবর্ষের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব সম্পর্কে তিনি পুরাতন আশ্বাসের পুনরাবৃত্তি করেন এবং বলেন যে ভারতে "ক্রমিক ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠাই" ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য।

অদূর ভবিষ্যতে ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার কোন প্রতিশ্রুতি না দেওয়ায়,রাষ্ট্র-মহাসভা এই ঘোষণায় সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। রাষ্ট্র মহাসভার মতে বর্তমান সংগ্রাম এক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যার জন্য ভারতকে স্বাধীনতা না দেওয়া সম্পূর্ণ যুক্তিহীন ; তাই রাষ্ট্র মহাসভা প্রাদেশিক কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলসমূহকে ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের মনোভাবের প্রতিবাদ স্বরূপ পদত্যাগ করিতে নির্দেশ দেয়। এই সময়ে ব্রিটিশ ভারতীয় এগারটি প্রদেশের মধ্যে বাংলা, পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশ বাদে বাকি আটটি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল বর্তমান ছিল। ঐ সকল কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলও তখন পর পর এই নির্দেশ অনুসারে পদত্যাগ করে। আসাম ব্যতীত অন্য সকল প্রদেশে আইন-সভায় অধিকাংশ সভ্যের আস্থাভাজন এবং মন্ত্রিসভা গঠনে ইচ্ছুক কোন যোগ্য ব্যক্তির সন্ধান মিলিল না। কাজেই গভর্নরগণ প্রাদেশিক শাসন-যন্ত্র বিকল হইয়াছে—এইরূপ ঘোষণা করিয়া নিজ নিজ প্রদেশের শাসন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। অবশ্য, শাসন কার্যে সাহায্যের জন্য তাঁহারা প্রত্যেক প্রদেশে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের জন কয়েক কর্মচারী লইয়া সঙ্গে সঙ্গে এক একটি পরামর্শ-সভাও (Advisory Council) গঠন করেন।

ইহার পর অধুনা (৮ আগষ্ট, ১৯৪০) বড়লাট এক **নূতন ঘোষণা করিয়াছেন** যে (১) বড়লাটের কাউন্সিলের সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া জননায়ক ভারতীয়দের লওয়া হইবে ; (২) যুদ্ধ পরামর্শ সভা গঠিত হইবে, তাহাতে দেশীয় রাজ্যের পক্ষ হইতেও সভ্য লওয়া হইবে ; (৩) যুদ্ধান্তে ভারতের সমস্যা সমাধানে ব্রিটিশ সরকার সর্বপ্রকার সাহায্য করিবেন।

এই প্রস্তাবও কংগ্রেস, মুস্লিম লীগ প্রমুখ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় কার্যকরী হয় নাই।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থা

"শাসন-পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়া প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকারকে বর্তমান ব্যবস্থার তুলনায় অধিকতর স্বাধীন শাসন ক্ষমতা প্রদান না করিলে, আপনারা ভারতবর্ষের কিছুমাত্র উন্নতিও করিতে পারিবেন না ···প্রাদেশিক শাসন-পদ্ধতিকে আমরা প্রদেশবাসীদের স্বায়ত্ত-শাসন-পদ্ধতিতে পরিণত করিতে চাহি ;—রাজকর্মচারি নিয়ন্ত্রিত শাসন-পদ্ধতিতে নহে।*

—জন্ ব্রাইট (১৮৫৮ সালের "উৎকৃষ্টতর ভারতীয় শাসন-তন্ত্র" আলোচনা প্রসঙ্গে হাউস্-অব্-কমন্সে প্রদত্ত বক্তৃতা)।

ক্রম-বিবর্তন—ইংরেজ ঐতিহাসিক সীলির (Seeley) কথায়, ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজ্যলাভ ও রাজ্যবিস্তার একরূপ তাহাদের অজ্ঞাতেই ঘটিয়াছিল। গোড়ার দিকে, সেজন্য শাসন-ব্যবস্থার কোন সু-সমঞ্জস আয়োজন ছিল না। ১৭২৬ সালে রাজা প্রথম জর্জের নিকট হইতে কোম্পানী যে সনন্দ লাভ করে, তাহাতে বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের স-পরিষদ গভর্নরকে আইন-প্রণয়ন হইতে শাসনের সমস্ত ভারই অর্পণ

* You will not make a single step towards the improvement of India, unless you change your whole system of government, unless you give to each Presidency a government with more independent powers than are now possessed··· What we want to make is to make the governments of the Presidencies, governments of the people of the Presidencies ; not governments of the civil servants of the Crown."—John Bright.

করা হয়। ক্রমে এই তিন প্রদেশের শাসন-ব্যবস্থার সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। তাই, ১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং এ্যাক্ট অনুসারে মাদ্রাজ ও বোম্বাই সরকারকে বাংলার স-পরিষদ গভর্নর জেনারেলের কর্তৃত্বাধীন করা হইল। কার্যত কিন্তু ইহাতেও তেমন কোন সুফল ফলিল না; তিন প্রদেশের আইন ও শাসনকার্যের অসামঞ্জস্য দিন দিন বাড়িয়াই চলিল।

১৮৩৩ সালের সনন্দ অনুসারে মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশ আইন প্রণয়নের অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। আইন-বিভ্রাট দূর করিবার জন্য এই সময়ে জন কয়েক আইনজ্ঞ নিযুক্ত হন এবং বাংলার বড়লাট-পরিষদে একজন আইন-সচিব নিযুক্ত করা হয়। এই ব্যবস্থায় প্রাদেশিক সরকার সমূহের মত গ্রহণের সহজ কোন উপায় ছিল না। কাজেই, ১৮৫৩ সালের সনন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন প্রদেশের সরকারি প্রতিনিধি লইয়া একটি ভারতীয় **ব্যবস্থাপক সভা** গঠিত হইল। এই প্রতিনিধিদের কেহই কিন্তু ভারতীয় ছিলেন না।

ক্রমে প্রাদেশিক সরকারগুলির স্বাতন্ত্র্য ও স্থানীয় (local) অবস্থানুসারে ব্যবহার প্রয়োজনীয়তা অনেকেই উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। অতঃপর ১৮৬১ সনের পার্লামেন্টীয় আইনে প্রদেশসমূহ বহু বৎসর পরে আবার আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা লাভ করে। আর্থিক ব্যাপারেও প্রাদেশিক সরকারসমূহকে অনুরূপ স্বাধীনতা প্রদানের চেষ্টা চলিতে থাকে। *

* ভারতীয় **প্রদেশসমূহের গঠনেতিহাস** সত্যই কৌতূহলোদ্দীপক। ইংরেজ বণিকদের বাণিজ্য কুঠি হইতেই মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশ দুইটির সৃষ্টি। ১৮৪৩ খ্রীঃ অব্দে সিন্ধুদেশ বিজিত হইয়া বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। বাংলা প্রেসিডেন্সি ১৭৭৩ সনের আইন অনুসারে গভর্নর জেনারেল কর্তৃকই শাসিত হইত এবং প্রথমত উহার

১৯১৯ সনের আইনে প্রদেশগুলি অধিকতর ক্ষমতা লাভ করে। অবশ্য এই একরাষ্ট্রীয় শাসন-তন্ত্রের আমলে প্রাদেশিক সরকারসমূহের কেন্দ্রীয় সরকার নিরপেক্ষ কোন স্বাধীন ক্ষমতা তখন পর্যন্তও ছিল না। প্রাদেশিক সরকারের যাবতীয় ক্ষমতাই ছিল কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত এবং প্রয়োজন মত উহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের অধিকারও ছিল।

বিস্তৃতি ছিল উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ (মোটামুটি বর্তমান যুক্তপ্রদেশ অঞ্চল) পর্যন্ত। কিন্তু ১৮৩৬ সালে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ একজন লেফ্‌টেন্যাণ্ট্‌ গভর্নরের অধীনে ন্যস্ত হয়। পরে, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নিমিত্ত একজন লেফ্‌টেন্যাণ্ট্‌ গভর্নর নিযুক্ত হ'ন।

১৮২৬ সালে আসাম বিজিত হইয়া বাংলা দেশের সহিত সংযুক্ত হয়, কিন্তু ১৮৪৭ সনে আবার বিচ্ছিন্ন হইয়া এক চীফ্‌-কমিশনারাধীন প্রদেশে পরিণত হয়। ১৯০৫ সনে পূর্ববঙ্গ ও আসাম স্বতন্ত্র এক প্রদেশরূপে একজন লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্নরের শাসনাধীনে ন্যস্ত হইয়াছিল. পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার-উড়িষ্যা তখন আর একজন লেফ্‌টেন্যাণ্ট্‌ গভর্নরের শাসনাধীনে থাকে। ১৯১২ সালে এই ব্যবস্থা পরিবর্তিত হইলে, খণ্ডিত বাংলা দেশ একজন গভর্নরের, আসাম একজন চীফ্‌-কমিশনারের এবং বিহার-উড়িষ্যা একজন লেফটেন্যাণ্ট্‌ গভর্নরের শাসনাধীনে আসে। ১৯১৯ সনের আইনে আসাম ও বিহার-উড়িষ্যা দুইজন গভর্নরের অধীন হয়। ১৯৩৫ সনের আইনে বিহার এবং উড়িষ্যা দুইটি গভর্নর-শাসিত প্রদেশে পরিণত হইয়াছে।

১৮৪৯সালে পাঞ্জাব প্রদেশ বিজিত হয় এবং প্রথমে এক শাসন পরিষদ ও পরে একজন চীফ্‌-কমিশনারের শাসনাধীনে থাকে। ১৮৫৭সালে দিল্লী ইহার সহিত সংযুক্ত হইলে, ইহা এক লেফ্‌টেন্যাণ্ট্‌ গভর্নরের অধীনে ন্যস্ত হয়। ১৯১৯ সনের আইনে পাঞ্জাব গভর্নরের শাসনাধীনে আসে।

১৮৫৬ সালে অযোধ্যা ইংরেজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া একজন চীফ্‌-কমিশনারের অধীন হয় এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে একজন লেফ্‌টেন্যাণ্ট্‌-গভর্নরের অধীনে ন্যস্ত হয়। পরে ১৮৭৭ সনে অযোধ্যা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ একজন লেফ্‌টেন্যাণ্ট্‌ গভর্নর কর্তৃক শাসিত হইবার ব্যবস্থা হয়। লর্ড কার্জনের আমলে এই উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের নাম

১৯৩৫ সনের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র অনুসারে প্রাদেশিক সরকার সমূহের নির্দিষ্ট কতগুলি প্রাদেশিক বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার নিরপেক্ষ স্বাধীন ক্ষমতা রহিয়াছে। প্রাদেশিক সরকারের এই ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদত্ত নহে, উহা মূল শাসনতন্ত্রেরই ব্যবস্থা, ইহাতে পার্লামেণ্টের অনুমোদন ব্যতীত এবং বিশেষ অবস্থায় ভিন্ন, কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকারই নাই। এই নূতন ব্যবস্থায় প্রদেশসমূহ আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা লাভ করিয়াছে, বলা হয়। এই ক্ষমতাই **প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন** (Provincial Autonomy)

"আগ্রা ও অযোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশ" রাখা হয়। ১৯১৯ সনের আইনে ইহাকে গভর্নরের শাসনাধীন করা হয়।

নিম্ন ব্রহ্মদেশ ১৮৬২ সালে চীফ্-কমিশনারের অধীনে ন্যস্ত হয়। ১৮৮৬ সনে উত্তর ব্রহ্মদেশ উহার সহিত যুক্ত হইল এবং ১৮৯৭ সালে এই যুক্ত ব্রহ্মদেশ শাসনের জন্য একজন লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্নর নিযুক্ত হ'ন। ১৯১৯ সনের আইনে ব্রহ্মদেশ গভর্নরের শাসনাধীন প্রদেশ হয় এবং ১৯৩৫ সনের আইনে এডেনের মত, ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভিন্ন দেশে পরিণত হয়।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কিয়দংশ ও উত্তরাধিকারীহীন কতিপয় দেশীয় রাজ্য লইয়া মধ্যপ্রদেশ গঠিত হয় এবং ১৮৬১সালে উহা চীফ্ কমিশনারের অধীনে ন্যস্ত হয়। ১৯০৩ সালে নিজামের নিকট হইতে বেরার অঞ্চল চিরস্থায়ী ইজারা লইলে, উহাকে মধ্যপ্রদেশের সহিত যুক্ত করা হয়। ১৯১৯ সনে মধ্যপ্রদেশ ও বেরার গভর্নরের শাসনাধীনে আসে। ১৯৩৫ সালের আইনের পরে ব্যবস্থা হইয়াছে যে, মধ্যপ্রদেশের গভর্নরের শাসনাধীনে থাকিলেও বেরার নিজামের রাজ্য বলিয়া স্বীকৃত হইবে এবং নিজামের নাম হইবে হায়দ্রাবাদ ও বেরারের নিজাম, আর নিজামের উত্তরাধিকারীর নাম হইবে প্রিন্স্ অব্ বেরার।

ভারতের নিরাপত্তার জন্য ১৯০১ সনে পাঞ্জাব হইতে কতিপয় জেলা লইয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ গঠিত হয় এবং উহা চীফ্-কমিশনারের শাসনাধীনে রাখা হয়। ১৯৩১ সনে উহা গভর্নরের

নামে পরিচিত। ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই নূতন ব্যবস্থা রাজকীয় ঘোষণা দ্বারা প্রবর্তিত হইয়াছে।

ইহার আগেই, ১৯৩৬ সনের এপ্রিল মাসে সিন্ধু ও উড়িষ্যা ভিন্ন প্রদেশে পরিণত হয়। ব্রহ্মদেশও ১৯৩৭ সনের এপ্রিল মাসে ভারতের বহির্ভূত ভিন্ন দেশে পরিণত হইয়াছে; অবশ্য ভারত-সচিবই ব্রহ্ম-সচিব-রূপেও কার্য করিতে থাকিবেন। বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, সিন্ধু এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—এই ১১টি গভর্নর শাসিত প্রদেশে উপরিউক্ত প্রাদেশিক সংস্কার প্রবর্তিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে স-কাউন্সিল রাজা যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভা এবং সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক আইন-সভার মতামত শুনিয়া নূতন গভর্নর শাসিত প্রদেশ গঠন করিতে পারিবেন, ব্যবস্থা হইয়াছে।

ব্রিটিশ বেলুচিস্থান, দিল্লী, আজমীর, মারওয়ার, কুর্গ, আন্দামান ও নিকোবর-দ্বীপপুঞ্জ এবং পান্থ্ পিপ্লোডা অঞ্চলসমূহ চীফ্-কমিশনারের অধীনে রহিয়াছে। এডেনকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। গভর্নর জেনারেল এই সব স্থানে চীফ্-কমিশনার নিযুক্ত করিয়া, তাঁহাদের সাহায্যে শাসন পরিচালনা করিবেন। ব্রিটিশ বেলুচিস্থানে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন ও গভর্নর-জেনারেলের আইন প্রয়োগের বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে; এবং কুর্গের আইন-সভাও ব্যাহত রহিয়াছে।

শাসনাধীনে ন্যস্ত হয়। ১৮৮৭ সালে ইংরেজাধিকৃত বেলুচিস্থান চীফ্-কমিশনার শাসিত প্রদেশে পরিণত হয়। ১৮৩৪ সনে কুর্গ ইংরেজ রাজ্যের সহিত যুক্ত হয়; ইহার শাসনকর্তা একজন চীফ্-কমিশনার। আজমীর ইংরেজাধীনে আসে ১৮১৮ সালে। আজমীর-মারওয়ার বর্তমানে চীফ্-কমিশনারের শাসনাধীনে আছে। আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপ-পুঞ্জের জন্যও ১৮৭২ সনে একজন চীফ্-কমিশনার নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। ১৯১২ সনে কলিকাতা হইতে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইলে, দিল্লী নগরী ও তাহার নিকটস্থ স্থান লইয়া একটি ক্ষুদ্র প্রদেশ গঠিত হয় এবং উহাও জনৈক চীফ্-কমিশনারের অধীনে অর্পিত হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাদেশিক কর্ম-বিভাগ (Provincial Executive)

গভর্নর—নূতন শাসন-তন্ত্র অনুযায়ী প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহা আগেই বলিয়াছি। প্রদেশের ব্যাপারে সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে গভর্নর এখন প্রাদেশিক শাসন নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করিবেন। অবশ্য, শাসন-কার্যে তাঁহাকে সাহায্য ও পরামর্শদানের জন্য একটি মন্ত্রিমণ্ডলী থাকিবে। গভর্নর সাধারণত ৫ বৎসরের জন্য সম্রাট্ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। নিয়োগকালে তিনি যে রাজোপদেশ-লিপি (Instrument of Instructions) পাইবেন, শাসনতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা ও তদনুসারে তিনি প্রাদেশিক শাসন পরিচালনা করিবেন।

প্রাদেশিক শাসন-কার্যে গভর্নরই সর্বময় কর্তা; প্রদেশের সকল বিষয়ে তাঁহার চরম কর্তৃত্ব ও শেষ হস্তক্ষেপের অধিকার রহিয়াছে। কেননা, প্রাদেশিক শাসনের দায়িত্ব তাঁহার হস্তেই ন্যস্ত। ইহা ছাড়া, গভর্নর জেনারেলের মত গভর্নরেরও কতকগুলি **বিশেষ দায়িত্ব** (special responsibility) আছে। সেই বিষয়গুলি এই—

(১) প্রদেশ বা তাহার অংশ-বিশেষের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষণ;

(২) সংখ্যাল্প সম্প্রদায় সমূহের আইন সঙ্গত অধিকার সংরক্ষণ;

(৩) সরকারি কর্মচারি ও তাহাদের পরিবারবর্গের ন্যায্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ;

(৪) ইংল্যাণ্ড, ব্রহ্মদেশ বা ব্রিটিশ প্রজা সম্পর্কিত বৈষম্যমূলক আইন ও কার্যাদি প্রতিরোধ;

(৫) আংশিক ভাবে সাধারণ শাসনের বহির্ভূত অঞ্চল সমূহের (Partially Excluded Areas) শান্তি ও সুশাসন রক্ষণ;

(৬) ভারতীয় করদ ও মিত্ররাজ্য এবং নৃপতিগণের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষণ; এবং

(৭) যুক্তরাষ্ট্র ও প্রদেশসমূহের শাসন সম্পর্কে নিজ দায়িত্বে গভর্নর জেনারেল কর্তৃক প্রদত্ত আইনসঙ্গত আদেশ ও নির্দেশ প্রতিপালন।

ইহা ছাড়া, পুলিস বিভাগ সম্বন্ধেও গভর্নরের বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে। এই বিভাগের আভ্যন্তরিণ পরিচালনার ভার সম্পূর্ণভাবে ইন্সপেক্টর জেনারেলের হাতে থাকিবে। এই সম্পর্কে কোন আইন-কানুন পরিবর্তন করিতে হইলে, পূর্বে গভর্নরের অনুমতি আবশ্যক হইবে। এই বিভাগের উপর যাহাতে কোন রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার লাভ না করে, গভর্নর তাহা লক্ষ্য করিবেন।

কয়েকটি প্রদেশের গভর্নরের আবার কয়েকটি বিশিষ্ট দায়িত্ব আছে। গভর্নরদের, বিশেষ করিয়া বাংলার গভর্নরের, বিপ্লব দমন সম্পর্কে বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে। বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা উপস্থিত হইলে, তাহা দমন করিবার জন্য গভর্নর তাঁহার "ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধি" ও "নিজ বিবেচনা মত" প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিবেন। প্রয়োজন হইলে, তিনি এইজন্য জনৈক কর্মচারি অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। এই কর্মচারি ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত থাকিতে ও তথায় বিপ্লব সম্বন্ধে গভর্নরের বক্তব্য প্রকাশার্থে বক্তৃতা দিতে পারিবেন; কিন্তু তাঁহার ভোটের অধিকার থাকিবে না। বৈপ্লবিক কার্যাবলী সম্পর্কিত খবরাখবর যাহাতে ইন্সপেক্টর জেনারেল্-অব-পুলিস, কমিশনার-অব্-পুলিস বা গভর্নর নির্দিষ্ট কর্মচারি ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ না হয়, গভর্নর এমন ব্যবস্থাও করিতে পারিবেন। ইহা ব্যতীত, মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের গভর্নরের বেরারের হিতার্থে ঐ প্রদেশের রাজস্বের ন্যায্য অংশ ব্যয় করার দায়িত্বও থাকিবে। সিন্ধু গভর্নরের লয়েড্ বাঁধ ও খালের (Lloyd or Sukkur Barrage) সুব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ দায়িত্ব থাকিবে। এই সব

বিশেষ অধিকারের ক্ষেত্র ব্যতীত, অন্যান্য বিষয়েও গভর্নর নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য মন্ত্রি সভা বা প্রাদেশিক আইন-সভার মতামত অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন ; অবশ্য সে সকল ব্যাপারে গভর্নর গভর্নর-জেনারেলের অধীনে কর্ম করিবেন। গভর্নরের "বিশেষ দায়িত্ব" পরিচালনার জন্য তাঁহাকে কার্যকরী, আইন-প্রণয়ন ও অর্থ-বিভাগে কয়েকটি বিশেষ ক্ষমতাও (sp cial po wers) দেওয়া হইয়াছে।

গভর্নর তাঁহার "ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধি" ও "নিজ বিবেচনা মত" এই সকল বিশেষ দায়িত্ব নির্বাহ করিবেন। *

মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ করিয়া গভর্নর প্রদেশের শাসন-পরিচালনার নিয়মাদি স্থির করিবেন। তাঁহার বিশেষ দায়িত্ব সম্পর্কিত কোন কার্য কোন মন্ত্রী বা সেক্রেটারির বিবেচনাধীন থাকিলে তাহা পূর্বাহ্ণেই গভর্নরকে জানাইতে হইবে।

মন্ত্রি-সভা (Council of Ministers)

প্রাদেশিক শাসন সুপরিচালনার জন্য প্রতি প্রদেশেই এক একটি মন্ত্রি-সভা থাকিবে। গভর্নরকে শাসন-কার্যে সাহায্য ও পরামর্শ দানই হইবে এই মন্ত্রি-সভার কর্তব্য। গভর্নর তাঁহার নিজ বিবেচনামত মন্ত্রী মনোনীত করিবেন। তবে গভর্নরে প্রতি রাজোপদেশ-লিপিতে বলা হইয়াছে যে, আইন-সভার অধিক সংখ্যক সভ্যের বিশ্বাস-ভাজন ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিয়া এবং যথোপযুক্ত সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি

* গভর্নর জেনারেলের মত গভর্নরও যখন "ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি অনুসারে" কার্য করিবেন, তখন মন্ত্রীদের সঙ্গে একমত না হইলে তিনি স্বয়ং যেরূপ সঙ্গত মনে করেন, সেইরূপ ব্যবস্থাই করিবেন। আর, যে সব ব্যাপারে তিনি "নিজ বিবেচনামত" কার্য করিতে অধিকারী, সে সম্বন্ধে মন্ত্রীদের মতামত জানিবারও কোন প্রয়োজন নাই।

লইয়া গভর্নর তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিবেন। ইহা ছাড়া গভর্নর মন্ত্রীদের মধ্যে যুক্তদায়িত্ব oint responsibility) প্রবর্তন করিতেও চেষ্টা করিবেন। গভর্নর ইচ্ছা করিলে, মন্ত্রি-সভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।

প্রত্যেক মন্ত্রীই এক বা ততোধিক শাসন-বিভাগ পরিচালনা ও পরিদর্শন করিবেন। নিয়োগের ছয় মাসের মধ্যে কোন মন্ত্রী প্রাদেশিক আইন-সভার সভ্য না হইলে পরে আর মন্ত্রীত্ব করিতে পারিবেন না। এতদ্বারা কার্যত সংখ্যাগরিষ্ঠদলের মন্ত্রিত্ব ও মন্ত্রীদের যুক্ত-দায়িত্বের নীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। অধিকসংখ্যক সভ্যের সমর্থন লাভ না করিতে পারিলে, ব্যবস্থাপক সভার সংখ্যা-গরিষ্ঠদল মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা-জ্ঞাপক প্রস্তাব পাশ করাইয়া মন্ত্রীদের বিতাড়িত করিতে পারিবেন।

নূতন আইন অনুসারে প্রাদেশিক শাসনে যে সব বিষয়ে গভর্নরের স্বেচ্ছামত কার্য করিবার অধিকার রহিয়াছে, তাহা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে তিনি মন্ত্রীদের পরামর্শ মতই কার্য করিবেন। অবশ্য, মন্ত্রীদের পরামর্শ গভর্নরের নিজ দায়িত্ব পালনের প্রতিকূল হইলে, তিনি ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি অনুসারেই কার্য করিবেন। গভর্নর মন্ত্রীদের মতবিরুদ্ধ কার্য করিলে, মন্ত্রি-সভা অবশ্য পদত্যাগ করিতে পারেন। রাজোপদেশ-লিপিতে বলা হইয়াছে, যাহাতে এই বিশেষ দায়িত্বের সুযোগ গ্রহণ করিতে না হয় গভর্নর যথাসম্ভব তাহার চেষ্টা করিবেন।

অন্য মন্ত্রীরা অর্থ-মন্ত্রীর সহির পরামর্শান্তে ব্যয়ের বরাদ্দ করিবেন। অর্থ-মন্ত্রীর সহিত এই বিষয়ে মতানৈক্য ঘটিলে, মন্ত্রিমণ্ডল সমবেতভাবে উহা সাব্যস্ত করিবেন।

মন্ত্রীদের বেতন প্রাদেশিক আইন-সভাই স্থির করিবেন। কিন্তু কোন মন্ত্রিমণ্ডলের কার্যকাল-মধ্যে মন্ত্রীদের বেতনের হার পরিবর্তন করা চলিবে না। রাজোপদেশ-লিপি বিরোধী বলিয়া পরিগণিত গভর্নরের

কোন কার্য বা মন্ত্রীরা গভর্নরকে যে পরামর্শ দিবেন, সে সম্বন্ধে আদালতে কোন বিচার বা আলোচনা চলিতে পারিবে না।

প্রাদেশিক মন্ত্রি-সভায় কয়জন মন্ত্রী থাকিবেন, ভারত-শাসন-আইনে তাহার কোন উল্লেখ নাই। প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রীদের সংখ্যা সকল প্রদেশে এক নহে। মন্ত্রীদের মধ্যে যাঁহাকে গভর্নর প্রথম আহ্বান করিয়া মন্ত্রিসভা গঠনের দায়িত্ব দিয়াছেন, তাঁহাকে বলা হয় প্রধান মন্ত্রী।

এ্যাড্‌ভোকেট্‌-জেনারেল্‌ (Advocate-General)—প্রত্যেক প্রদেশেই হাইকোর্টের বিচারক হইবার যোগ্যতা-সম্পন্ন, কোন এক ব্যক্তিকে গভর্নর প্রাদেশিক এ্যাড্‌ভোকেট্‌-জেনারেল্‌ নিযুক্ত করিবেন। তাঁহার বেতন, কার্যকাল ও পদচ্যুতি প্রভৃতি গভর্নরই নিজ বিবেচনামত সাব্যস্ত করিয়া দিবেন। প্রাদেশিক সরকারকে যাবতীয় আইন-ঘটিত ব্যাপারে প্রয়োজনমত উপদেশ দেওয়াই হইবে এ্যাড্‌ভোকেট্‌-জেনারেলের কর্তব্য। তিনি প্রাদেশিক আইন-সভার আলোচনায় যোগ দিতে পারিবেন, কিন্তু তাঁহার ভোট দেওয়ার অধিকার থাকিবে না।

ইহা ছাড়া, গভর্নর ইচ্ছা করিলে, তাঁহাকে উপদেশ দেওয়ার জন্য প্রাদেশিক ব্যাপারসমূহে অভিজ্ঞ এক ব্যক্তিকে তাঁহার **সেক্রেটারি** নিযুক্ত করিতে পারিবেন। গভর্নর নিজ কার্যের সুবিধার জন্য অন্যান্য কর্মচারিও রাখিতে পারিবেন। মন্ত্রিগণ এইসকল কর্মচারিকে কোন আদেশ করিতে পারিবেন না।

প্রাদেশিক দপ্তরখানা (Provincial Secretariate)

শাসনের সুবিধার জন্য প্রত্যেক দেশেই শাসনের বিষয়সমূহকে কতগুলি ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে। প্রত্যেকটি বিভাগ আবার একজন সেক্রেটারি ও জনকয়েক সহকারী সেক্রেটারির অধীনে ন্যস্ত থাকে। কেন না, মন্ত্রিগণ কেবল শাসন-কার্যের মূল বিষয়সমূহই পরিচালনা

করিতে পারেন; বিভাগীয় দৈনন্দিন কার্যগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সম্পাদন করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। মন্ত্রিগণ আবার সাধারণত আইন সভার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হইয়া থাকে; তাই মন্ত্রীদের দ্বারা শাসনকার্যে ধারাবাহিকতা রক্ষাও সম্ভব হয় না। এই জন্যই, মন্ত্রিমণ্ডলের অধীনে এক **স্থায়ী সেক্রেটারিয়েট্ বা দপ্তরখানার** ব্যবস্থা হইয়া থাকে। ভারতেও সেই ব্যবস্থাই আছে।

ভারতের প্রদেশসমূহে সেক্রেটারিদের সংখ্যা সর্বত্র সমান নহে। সেক্রেটারিরা কিন্তু নিজ নিজ বিভাগের ভার-প্রাপ্ত মন্ত্রীর নিকট দায়ী। ইঁহাদের কার্যকাল সাধারণত ৩ বৎসর। অভিজ্ঞ আই, সি, এস্ বা অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারিদের মধ্য হইতে এই সকল সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হয়। সরকারের স্থায়ী কর্মচারিরূপে পরিবর্তনশীল মন্ত্রি-মণ্ডলীকে ইঁহারা সকল কার্যেই পরামর্শ দিবেন ও সাহায্য করিবেন। মন্ত্রীদের নির্দেশমত কর্মবিভাগের কার্যাদি পরিচালনাও ইঁহাদের অন্যতম কর্তব্য।

অবশ্য, প্রতি বিভাগেই আবার সেক্রেটারির অধীনে স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মচারি থাকিবেন। প্রাদেশিক দপ্তরখানা সাধারণত নিম্নলিখিত বিভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে :—

(১) স্বরাষ্ট্র; (২) অর্থ; (৩) স্বাস্থ্য; (৪) স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন; (৫) কৃষি; (৬) শিল্প; (৭) যানবাহন; (৮) পূর্ত; (৯) বাণিজ্য; (১০) শ্রম; (১১) শিক্ষা; (১২) পুলিস ও জেল; (১৩) রাজস্ব; (১৪) সমবায়; (১৫) রেজিস্টেশন; (১৬) বন; (১৭) আবগারি, ইত্যাদি।

ইহাদের মধ্যে এক বা একাধিক বিভাগ এক একজন মন্ত্রী ও এক একজন সেক্রেটারির অধীনে থাকে। উপরিউক্ত সেক্রেটারিগণ কমিশনার, ম্যাজিস্টেট্ প্রভৃতিকে পরিচালিত করেন। সেক্রেটারিদের অধীনে

আবার পুলিসের ইন্সপেক্টর্ জেনারেল্, জেলের ইন্সপেক্টর্ জেনারেল্, শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর্, কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর্, আবগারি বিভাগের কমিশনার্, রেজিস্ট্রেশন-বিভাগের ইন্স্পেক্টর্ জেনারেল্ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগীয় কর্মচারিও আছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাদেশিক আইন-সভা

প্রতি গভর্নর-শাসিত প্রদেশেই * রাজার প্রতিনিধিরূপে গভর্নর ও **লেজিস্‌লেটিভ এ্যাসেম্‌ব্লি** (Legislative Assembly) বা **ব্যবস্থাপক সভা**-যুক্ত এক আইন সভা থাকিবে। কিন্তু বাংলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও আসাম—এই ছয়টি প্রদেশে উপরিউক্ত লেজিস্‌লেটিভ্ এ্যাসেম্‌ব্লি বা ব্যবস্থাপক সভা ব্যতীত, **লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিল্** (Legislative Council) বা **আইন পরিষদ** নামে আইন-সভার এক উর্ধ্ব পরিষদও থাকিবে।

গভর্নরের শেষ সম্মতি ব্যতীত কোন আইনই কার্যকরী হইতে পারে না। গভর্নরকে তাই আইন-সভার এক অপরিহার্য অঙ্গ বলা যাইতে পারে।

ব্যবস্থাপক সভা (Legislative Assembly)—প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা এক নির্বাচনের পর ৫ বৎসরের অধিক স্থায়ী হইবে না; এই ৫ বৎসর পরে আবার সাধারণ নির্বাচন দ্বারা নূতন সভা গঠিত হইবে। অবশ্য গভর্নর ইচ্ছা করিলে, এই ৫ বৎসরের আগেও ব্যবস্থাপক সভা

* চীফ-কমিশনার-শাসিত প্রদেশসমূহের (ব্রিটিশ বেলুচিস্থান, দিল্লী, আজমীর-মারওয়ার, কুর্গ, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং পান্থ-পিপ্‌লোডা) মধ্যে একমাত্র কুর্গেই একটি আইন-সভা রহিয়াছে।

ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেন। এই প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা হইতেই যুক্তরাষ্ট্রীয় এ্যাসেম্ব্লি বা সম্মিলিত পরিষদের প্রাদেশিক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবে।

জন সংখ্যার অনুপাতে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য-সংখ্যা বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্নরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। বাংলায় ইহার মোট সভ্য-সংখ্যা ২৫০, এবং আসামে ১০৮; বাংলায়ই এই সভ্য-সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশি। সকল প্রদেশেই ব্যবস্থাপক সভায় আবার **সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব** রহিয়াছে। সাধারণ, মুসলমান, খ্রীষ্টান ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং মহিলা, শ্রমিক, জমিদার, ব্যবসায়ী প্রভৃতির জন্যও পৃথক্ পৃথক্ সভ্যপদ নির্দিষ্ট হইয়াছে।

বাংলার ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদ নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা হইয়াছে :—

সাধারণ—৭৮ (তন্মধ্যে অনুন্নত সম্প্রদায়—৩০), * মুসলমান—১১৭; ইঙ্গ-ভারতীয়—৩; ইউরোপীয়—১১; দেশীয় খ্রীষ্টান—২; শিল্প-বাণিজ্য—১৯; জমিদার—৫; বিশ্ববিদ্যালয়—২; শ্রমিক—৮; এবং মহিলা—৫ (তন্মধ্যে সাধারণ—২; মুসলমান—২; এবং ইঙ্গ-ভারতীয়—১), মোট—২৫০।

আইন-পরিষদ (Legislative Council)—বাংলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও আসাম—মাত্র এই ছয়টি প্রদেশেই লেজিস্লেটিভ্ কাউন্সিল্ বা আইন-পরিষদ নামে একটি ঊর্ধ্ব পরিষদেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা হইবে স্থায়ী পরিষদ, প্রত্যেক ৩ বৎসর পরে ইহার ⅓ অংশ সভ্য অবসর গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহাদের স্থানে নূতন সভ্য নির্বাচিত হইবেন। ইহার সভ্য-সংখ্যা সব প্রদেশে

* সাধারণ নির্বাচক বলিতে প্রকৃতপক্ষে হিন্দু (বর্ণ হিন্দু এবং অনুন্নত হিন্দু দুই-ই) নির্বাচকদেরই বুঝায়।

সমান নহে ; বাংলায় এই সভ্য-সংখ্যা ৬৫ ; আসামে মাত্র ২২। বাংলায়ই এই পরিষদের সভ্য রহিয়াছেন সর্বাপেক্ষা বেশি। আইন পরিষদে **সাম্প্রদায়িক নির্বাচন** এবং গভর্নর কর্তৃক **মনোনয়ন**-এর ব্যবস্থাও আছে। গভর্নরের মনোনীত সভ্য মাদ্রাজে ১০ জন (ইহাই সর্বোচ্চ সংখ্যা) এবং বাংলায় ৮ জন। এই ঊর্ধ্ব পরিষদের জন্য ব্যবস্থাপক সভা বঙ্গদেশে ২৭ জন ও বিহারে ১২ জন সভ্য নির্বাচন করিবে ; অন্য প্রদেশের নিম্নপরিষদ কিন্তু ঊর্ধ্ব পরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণ, অর্থাৎ **পরোক্ষ নির্বাচন**, করিতে পারিবে না।

যুক্তরাষ্ট্রে যতই উপযোগী হউক না কেন, প্রদেশ সমূহে এইরূপ ঊর্ধ্ব-পরিষদের প্রয়োজনীয়তা অনেকেই স্বীকার করেন না। অনর্থক ব্যয়ের প্রশ্ন বাদেও, জনপ্রতিনিধিমূলক নিম্ন পরিষদের কার্য ইহাতে অকারণ ব্যাহত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। জমিদার ও অর্থশালী ব্যক্তিরাই এইরূপ ঊর্ধ্ব পরিষদ দাবী করিয়াছিলেন ; এবং যেখানে এই দুই শ্রেণীর লোকের আধিক্য, কার্যত সেখানেই এই প্রকার ঊর্ধ্ব পরিষদ স্থাপিত হইয়াছে।

নির্বাচনাধিকার—পূর্বে নির্বাচনাধিকার বা ভোট দিবার ক্ষমতা প্রধানত সম্পত্তির উপরই নির্ভর করিত। তাই, তখন নির্বাচক ছিল শতকরা ৩ জন মাত্র। নূতন শাসন-তন্ত্রে সম্পত্তিশালী ব্যতীত, শিক্ষিত জনসাধারণ, মহিলা, শ্রমিক, অনুন্নত সম্প্রদায়, সৈনিক ও সেনা-বিভাগের কর্মচারি প্রভৃতিকেও আইন-সভার সভ্য নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ফলে, বর্তমানে নির্বাচকের সংখ্যা হইয়াছে শতকরা ১৪ জন।

ভোট দিবার যোগ্যতা সব প্রদেশেই সম্পূর্ণ এক নহে। তবে, নূতন আইন অনুসারে মোটামুটি নিম্নলিখিত যে কোন শ্রেণীর ব্যক্তিই প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন :—

(১) স্থানীয় নির্বাচন পরিধির (constituency) বাসিন্দা (যিনি

যেস্থানে সাধারণত বৎসরের বেশির ভাগই বাস করেন, তিনি সেখানকার বাসিন্দারূপে গণ্য হইবেন) ;

(২) সম্পত্তি কর-প্রদানকারী ;

(৩) ট্যাকস্-প্রদানকারী (ট্যাক্স্ বলিতে আয়কর ; মোটরকার-ট্যাক্স্ ; কলিকাতা কর্পোরেশন্ ও অন্যান্য শহরের মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স, লাইসেন্স্ ফি ইত্যাদি ; কমপক্ষে ৮ আনা পথ-কর ; এবং অন্তত ৬ আনা ইউনিয়ন্-কর প্রভৃতি বুঝাইবে) ;

(৪) ম্যাট্রিকুলেশন বা অনুরূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ;

(৫) সৈন্য বা সেনা-বিভাগের কর্মচারি (বর্তমান বা অবসর প্রাপ্ত);

ইহা ব্যতীত মহিলাদের জন্য ভোটদানের আরও কতগুলি অতিরিক্ত যোগ্যতার ব্যবস্থা হইয়াছে।

অবশ্য উপরিউক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিও অন্তত ২১ বৎসর বয়স্ক এবং ব্রিটিশ প্রজা বা যুক্তরাষ্ট্রান্তর্গত দেশীয় রাজ্যের প্রজা বা অন্য বিশিষ্ট দেশীয় রাজ্যের প্রজা কিংবা শাসক না হইলে, সভ্য-নির্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন না।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রাদেশিক আইন-সভার সভ্য হইতে পারিবেন না :—

(১) যিনি ব্রিটিশ প্রজা, বা যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী কোন দেশীয় রাজ্যের প্রজা বা শাসক, অথবা যুক্তরাষ্ট্রের বহির্ভূত নির্দিষ্ট দেশীয় রাজ্যের প্রজা বা শাসক নহেন ;

(২) (লেজিস্লেটিভ্ এ্যাসেম্ব্লি বা ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদ-প্রার্থী) যে ব্যক্তির বয়স ২৫ বৎসরের কম, এবং (লেজিস্লেটিভ্ কাউন্সিল্ বা আইন-পরিষদের সভ্যপদ-প্রার্থী) যে ব্যক্তির বয়স ৩০ বৎসরের কম ;

(৩) মন্ত্রী ব্যতীত সাধারণ সরকারি কর্মচারি বা দেউলিয়া, নির্বাচন সংশ্লিষ্ট অপরাধে অপরাধী বা অদালতের বিচারে বিকৃত-মস্তিষ্ক বলিয়া সাব্যস্ত ব্যক্তি ;

(৪) ব্রিটিশ ভারত বা যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী দেশীয় রাজ্যে কমপক্ষে ২ বৎসর কারাদণ্ড ভোগী ব্যক্তি (ঊর্ধ্বপক্ষে ৫ বৎসর পর্যন্ত);

(৫) নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করেন নাই, এমন নির্বাচনপ্রার্থী বা তাঁহার এজেন্ট (গভর্নর ঐ দোষ মার্জনা না করিলে বা ৫ বৎসর উত্তীর্ণ না হইলে);

উপরিউক্ত ভাবে অযোগ্য প্রমাণিত ব্যক্তি আইন-সভায় যোগদান করিলে প্রতিদিনের জন্য তাহাকে ৫০০ টাকা করিয়া জরিমানা দিতে হইবে।

আইন-সভা পরিচালনার সাধারণ নিয়মাদি—প্রাদেশিক আইন-সভার উভয় পরিষদেরই বৎসরে অন্তত একটি অধিবেশন হইবেই এবং উহাদের এক অধিবেশন হইতে আর এক অধিবেশনের মধ্যে ১২ মাসের বেশি ব্যবধান হইতে পারিবে না। এই নিয়মাধীনে গভর্নর নিজ ইচ্ছামত স্থানে ও সময়ে আইন-সভার এক বা উভয় পরিষদেরই অধিবেশন আহ্বান করিতে অথবা অধিবেশন স্থগিত রাখিতে পারিবেন। ইহা ছাড়া, তাঁহার নিম্ন পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিবার ক্ষমতাও আছে। গভর্নর আবার উভয় পরিষদেরই ভিন্ন বা যুক্ত অধিবেশনে বক্তৃতা করিতে পারিবেন: এবং তিনি এইরূপ বক্তৃতার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, অধিবেশন সভার আহূত হইবে। গভর্নর যে কোন পরিষদের বিবেচনাধীন আইনের পাণ্ডুলিপি বা অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার বাণী (message) প্রেরণ করিতে পারেন। এইরূপ বাণী প্রেরিত হইলে, পরিষদকে যথাশীঘ্র উহা বিবেচনা করিতে হইবে।

মন্ত্রী বা এ্যাড্‌ভোকেট্ জেনারেল্ পরিষদ দুইটির সাধারণ বা যুক্ত অধিবেশনে বা উহাদের কোন কমিটির সভ্য নিযুক্ত হইলে তথায় বক্তৃতা করিতে পারিবেন; মন্ত্রীরা ভোটও দিতে পারিবেন। দুই পরিষদ থাকিলে মন্ত্রীদের মধ্যে যিনি যে সভার সভ্য তাহাতে মাত্র তাঁহার ভোট দিবার অধিকার রহিয়াছে।

নির্বাচনের পরে সভ্যদিগকে রাজানুগত্যের নির্দিষ্ট শপথ গ্রহণ করিতে হইবে। প্রাদেশিক আইন-সভা কর্তৃক ব্যবস্থামত সভ্যগণ নির্ধারিত ভাতা পাইবেন।

সভ্যরা নিজেদের মধ্য হইতেই নিজ নিজ পরিষদের সভাপতি ও সহকারী সভাপতি নির্বাচন এবং তাঁহাদের বেতন নির্ধারণ করিবেন। লেজিস্‌লেটিভ্‌ এ্যাসেম্‌ব্লি বা ব্যবস্থাপক সভার সভাপতিকে "স্পীকার্" (Speaker) এবং সহকারী সভাপতিকে "ডেপুটি স্পীকার্" (Deputy Speaker) বলা হয়। আর, লেজিস্‌লেটিভ্‌ কাউন্সিল্ বা আইন-পরিষদের সভাপতিকে বলা হয় "প্রেসিডেন্ট্" (President) এবং সহকারী সভাপতিকে "ডেপুটি প্রেসিডেন্ট্" (Deputy President)। পরিষদের কার্যাদি সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালনা করাই ইঁহাদের কর্তব্য। অবশ্য, সভাপতি ও সহকারি সভাপতির নিয়োগ গভর্নরের সম্মতি আবশ্যক। ইঁহারা ইচ্ছা করিলে পদত্যাগ করিতে পারেন এবং সভ্যরাও তাঁহাদিগকে ভোটাধিক্য দ্বারা পদচ্যুত করিতে পারিবেন। পরিষদের সকল বিষয়ই ভোটাধিক্য দ্বারা মীমাংসিত হয়; কিন্তু কোন বিষয়ের সমর্থনকারী ও বিরোধী দলের ভোট সমান হইলে, সভাপতির ভোট দ্বারা উহার মীমাংসা হইবে। ইহা ছাড়া, সভাপতি সাধারণত ভোট দিতে পারিবেন না। এ্যাসেম্‌ব্লিতে ⅙ অংশ সভ্য এবং কাউন্সিলে মাত্র ১০ জন সভ্য উপস্থিত থাকিলেই পরিষদের অধিবেশন পরিচালনার অধিকার (Quorum) জন্মিবে।

কেহ যুগপৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভা ও প্রাদেশিক আইন-সভার সভ্য হইতে অথবা যুগপৎ প্রাদেশিক আইন-সভার উভয় পরিষদের সভ্য হইতে পারিবেন না। কোন সভ্য একাদিক্রমে ৬০ দিন পরিষদের অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকিলে, ঐ পরিষদ তাঁহাকে অপসারিত করিতে পারিবে। কোন সভ্য পরিষদে বা উহার কোন কমিটিতে বক্তৃতা বা ভোটের জন্য

আদালতে দণ্ডনীয় হইবে না। সভ্যদের অন্যান্য স্বাধীনতা বা অধিকার পরিষদই সাব্যস্ত করিবে। প্রাদেশিক আইন-পরিষদের কোন বিচার-ক্ষমতা নাই ; কিন্তু কোন সভ্য পরিষদের নিয়ম ভঙ্গ করিলে, পরিষদ তাঁহাকে বিতাড়িত করিতে পারিবে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতে বা হাইকোর্টের কোন বিচারকের কার্য সম্বন্ধে প্রাদেশিক আইন-সভায় কোন আলোচনা হইতে পারিবে না। আইন-সভায় গভর্নরের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব-বিরোধী প্রস্তাব বা আলোচনাদি গভর্নর নিরোধ করিতে পারিবেন।

নিয়মবিরুদ্ধ আলোচনার অজুহাতে আইন-সভার কার্যাদি কোন আদালতের বিচার-সাপেক্ষ হইবে না।

আইন-সভার কার্য সাধারণত ইংরেজি ভাষাতেই চলিবে, কিন্তু অনভিজ্ঞ সভ্যগণ অন্য ভাষা ব্যবহার করিতে পারিবেন।

আইন-সভা ও মন্ত্রিমণ্ডল—মন্ত্রীদের প্রতি কার্যেই প্রথমত গভর্নর ও দ্বিতীয়ত আইন-সভার অনুমোদন আবশ্যক হইবে। আইন-সভা যদি তাঁহাদের কার্য অনুমোদন না করেন, তবে তাঁহাদের পদত্যাগ করাই উচিত হইবে। মন্ত্রীদের অপসারিত করিতে চাহিলে, আইন-সভা তাঁহাদের উপর অনাস্থা-জ্ঞাপক প্রস্তাব (vote of no confidence) গ্রহণ করিতে পারিবেন। ভোটাধিক্যে এইরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইলে, মন্ত্রীদিগকে পদত্যাগ করিতে হয়। মন্ত্রীদের দ্বারা প্রস্তাবিত কোন বিল যদি আইন-সভা পাশ না করে, বা তাঁহাদের আর্থিক দাবীর টাকা কমাইয়া মঞ্জুর করা হয়, তবে তাহাও অনাস্থা-জ্ঞাপক বলিয়া গণ্য করা চলে।

আইন-প্রণয়ন প্রণালী—আইনসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে ; যথা—(১) সাধারণ আইন, (২) অর্থ-বিষয়ক আইন, এবং (৩) গভর্নর-কৃত আইন ও অর্ডিন্যান্স্।

সাধারণ আইন দ্বি-পরিষদযুক্ত প্রাদেশিক আইন-সভার যে কোন পরিষদে অর্থ-বিষয়ক বিল ব্যতীত অন্যান্য বিল উপস্থাপিত হইতে পারিবে। আইন পাশ হইতে সাধারণত উভয় পরিষদ ও গভর্নরের সম্মতি প্রয়োজন। লেজিসলেটিভ্ এ্যাসেম্ব্লি কোন বিল পাশ করিয়া লেজিসলেটিভ্ কাউন্সিলের নিকট প্রেরণ করিবার পরে এক বৎসরের মধ্যে উহা গভর্নরের সম্মতির নিমিত্ত উপস্থাপিত না হইলে গভর্নর উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিয়া ঐ বিল সম্পর্কে ভোট লওয়াইতে পারিবেন।

উভয় পরিষদের **যুক্ত অধিবেশনে** ঐরূপ বিল মিলিত সভ্যদের ভোটাধিক্যে পূর্ববৎ বা সংশোধন সহ পাশ হইলে, ইহা উভয় পরিষদ কর্তৃক পাশ হইল বলিয়া পরিগণিত হইবে। এইরূপ যুক্ত অধিবেশনে লেজিসলেটিভ্ কাউন্সিলের "প্রেসিডেণ্ট"ই সভাপতিত্ব করিবেন। লেজিসলেটিভ্ এ্যাসেম্ব্লি বা দ্বি-পরিষদযুক্ত প্রদেশে উভয় পরিষদ কোন বিল পাশ করিলে পর, গভর্নর "নিজ বিবেচনামত" সম্রাটের নামে উহাতে সম্মতি দিতে বা উহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন; অথবা এইরূপ বিল তিনি গভর্নর জেনারেলের সম্মতির জন্যও রাখিয়া দিতে পারেন, গভর্নর জেনারেল তখন সম্রাটের নামে উহা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করিবেন, নতুবা রাজার শেষ সম্মতির জন্য রাখিয়া দিবেন *

আইন-সভা কর্তৃক গৃহীত হইলেও, গভর্নর বা গভর্নর জেনারেল, অথবা সম্রাট অগ্রাহ্য করিলে কোন বিলই কার্যকরী হইবে না। সম্রাট্

* রাজোপদেশ লিপিতে বলা হইয়াছে যে, গভর্নর (১) ব্রিটিশ-ভারত সম্বন্ধীয় পার্লামেণ্টের আইন-বিরুদ্ধ, (২) হাইকোর্টের ক্ষমতা-বিরোধী, (৩) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিরোধী, এবং (৪) গভর্নরের "নিজ বিবেচনামত" কার্য করিবার অধিকার-বিরুদ্ধ বিল, গভর্নর জেনারেলের সম্মতির জন্য রাখিয়া দিবেন।

অবশ্য যে কোন বিলই আইনরূপে পরিগণিত হইবার পরে ১২ মাসের মধ্যে উহা বাতিল করিতে পারিবেন।

আবার, **গভর্নর জেনারেলের পূর্বানুমতি ব্যতীত** নিম্নলিখিত বিষয়ে কোন আইনের প্রস্তাব প্রাদেশিক আইন-সভায় উত্থাপিত হইতে পারিবে না :—

(১) ব্রিটিশ-ভারতে প্রযোজ্য পার্লামেণ্টের কোন আইনের বিরুদ্ধতা বা সংশোধন বা প্রত্যাহার ; (২) গভর্নর-জেনারেলের কোন আইন বা অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধতা বা সংশোধন বা প্রত্যাহার ; (৩) গভর্নর জেনারেল "নিজ বিবেচনা মত" যে সকল কার্য করিবার অধিকারী, তৎসম্পর্কিত কোন বিরোধিতা ; এবং (৪) ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা সংশ্লিষ্ট বিচার প্রণালীর বিরোধিতা।

অন্যদিকে, **গভর্নর অনুমোদন না করিলে** (১) গভর্নরের কোন আইন বা অর্ডিন্যান্স্ বিরোধী বিল, বা (২) পুলিস সম্বন্ধীয় আইন প্রত্যাহারকারী, সংশোধন বা বিরুদ্ধাচারী বিল ; বা (৩) আইন, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি ব্যবসা ও বাণিজ্য করিবার যোগ্যতা-অযোগ্যতা-সূচক বিল প্রাদেশিক আইন-সভায় উত্থাপিত হইতে পারিবে না। ইংল্যাণ্ডে বসবাস করিবার অধিকারী কোন ব্যক্তি বা কোম্পানির বিরুদ্ধে ভারতে প্রবেশ, সম্পত্তি ভোগ-দখল, চাকুরি ও ব্যবসা প্রভৃতি বিষয়ে এবং ট্যাক্স ইত্যাদি সম্পর্কে প্রাদেশিক আইন-সভা বৈষম্যমূলক আইন করিতে পারিবে না।

অর্থ-বিষয়ক আইন (Financial legislation)—অর্থ-বিষয়ক (অর্থাৎ, ট্যাক্স্ বসান, সরকারের রাজস্ব গ্রহণ ও ব্যয় সম্বন্ধীয়) কোন বিল বা প্রস্তাব গভর্নরের সম্মতি ব্যতীত আইন-সভায় উত্থাপিত হইতে পারিবে না। এই সকল বিল কেবল **লেজিস্‌লেটিভ্ এ্যাসেম্ব্লিতেই প্রথম উত্থাপিত** হইবে।

প্রতি বৎসরই সরকারের বাৎসরিক আনুমানিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বা বাজেট (Budget) আইন-সভায় উপস্থাপিত হইবে। বাজেটে অবশ্য দেয় ব্যয়ের বিষয় সমূহের পরিমাণ (sums charged on the revenues) এবং প্রস্তাবিত সাধারণ ব্যয়ের পরিমাণ ও বিষয় সমূহ (other expenditures) ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। গভর্নরের বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় খরচও পৃথক ভাবে দেখাইতে হইবে। নিম্নলিখিত যাবতীয় ব্যয়ই অবশ্য দেয়:—

(১) গভর্নরের বেতনাদি ও তাঁহার দপ্তরের যাবতীয় ব্যয়;

(২) প্রাদেশিক ঋণ ও তাহার সুদ প্রভৃতি;

(৩) মন্ত্রী ও এ্যাড্ভোকেট্-জেনারেলের বেতন ও ভাতা প্রভৃতি;

(৪) হাইকোর্টের বিচারপতিদের বেতন ও ভাতা প্রভৃতি;

(৫) বহিরাঞ্চল সমূহের (Excluded Areas) শাসনব্যয়;

(৬) আদালত এবং সালিসী বিচারের রায় অনুযায়ী ডিক্রীর দাবী পূরণের ব্যয়; এবং

(৭) ভারত-শাসন-আইন বা প্রাদেশিক আইন-নির্দিষ্ট অবশ্য দেয় ব্যয়সমূহ।

এই সকল অবশ্য দেয় ব্যয় সম্বন্ধে আইন-সভার ভোট দিবার অধিকার নাই। তবে ইহাদের মধ্যে প্রথম ধারার ব্যয় ব্যতীত, অন্যান্য ব্যয় সম্পর্কে আইন-সভা আলোচনা করিতে পারিবে, কিন্তু প্রথম ধারার ব্যয় সম্বন্ধে কোন আলোচনাও চলিতে পারিবে না।

এই অবশ্য দেয় ব্যয় ব্যতীত, প্রাদেশিক সরকারের সাধারণ ব্যয়ের প্রস্তাবগুলি মঞ্জুরের জন্য লেজিসলেটিভ্ এ্যাসেম্ব্লির নিকট দাবী (demands for grants) হিসাবে উপস্থিত করা হইবে। গভর্নরের অনুমতি লইয়া মন্ত্রি-সভা এই দাবী উপস্থিত করিবেন; সাধারণ সভ্যদের ট্যাক্স বসান বা বৃদ্ধি বা কোন ব্যয়ের প্রস্তাব পেশ করিবার

অধিকার নাই। এ্যাসেম্‌ব্লি এই দাবীর বিভিন্ন অংশ মঞ্জুর, না-মঞ্জুর অথবা হ্রাস করিতে পারিবে। কিন্তু ব্যয়মঞ্জুর সম্পর্কে উচ্চতর পরিষদের (Legislative Council) কোনও চরম ক্ষমতা নাই। গভর্নর তাঁহার বিশেষ দায়িত্ব পালনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ও সঙ্গত মনে করিলে, এ্যাসেম্‌ব্লি কর্তৃক না-মঞ্জুরকৃত ব্যয় নিজের ক্ষমতায় মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

ট্যাক্‌স ধার্য বা ট্যাক্‌স্ বৃদ্ধি, প্রাদেশিক সরকারি ঋণ নিয়ন্ত্রণ বা কোন ব্যয়কে অবশ্য দেয় ব্যয় বলিয়া ধার্য করা সম্পর্কে কোন প্রস্তাব করিতে হইলে গভর্নরের সুপারিশ চাই।

গভর্নরের আইন ও অর্ডিন্যান্স্—গভর্নর তাঁহার "বিশেষ দায়িত্ব" পালনের জন্য প্রয়োজন মনে করিলে, গভর্নর জেনারেলের সম্মতি লইয়া স্থায়ী আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন। এইরূপ আইন প্রণয়নের পূর্বে তিনি আইন-সভায় সে সম্বন্ধে শুধু এক সংবাদ অথবা সংবাদের সঙ্গে প্রস্তাবিত আইনের পাণ্ডুলিপি পাঠাইতে পারেন। শুধু সংবাদ পাঠাইলে, সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আইন কার্যকরী হইবে; আর প্রস্তাবিত আইনের পাণ্ডুলিপি পাঠাইলে, তাঁহার আইন কার্যকরী হইবে এক মাস পরে; ইতিমধ্যে আইন সভা আপন বক্তব্য জানাইতে পারে। এই আইনের নাম হইবে **গভর্নরের আইন**। আইন-সভার সম্মতি না থাকিলেও ইহা আইন-সভা কর্তৃক প্রণীত আইনের মতই কার্যকরী হইবে। এই আইন অবশ্য পার্লামেণ্টকে জানাইবার জন্য গভর্নর-জেনারেলের মারফত ভারত-সচিবের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কোন বিশেষ অবস্থা উপস্থিত হইলেই প্রয়োজনীয় অস্থায়ী আইন বা অর্ডিন্যান্স (Ordinance) প্রণয়ন করা হয়। পূর্বে কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে মাত্র গভর্নর-জেনারেলই অর্ডিন্যান্স্ প্রয়োগ করিতে পারিতেন; বর্তমান আইনে কিন্তু গভর্নরকেও এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

গভর্নর দুই রকম অর্ডিন্যান্স্ প্রবর্তন করিতে পারিবেন—(১) আইন-সভার অধিবেশন না থাকিলে গভর্নর তাঁহার "বিশেষ দায়িত্ব" বহির্ভূত বিষয়ে মন্ত্রীদের পরামর্শ মত জরুরী অবস্থায় অর্ডিন্যান্স্ প্রয়োগ করিতে পারেন। কিন্তু যে সকল আইনের প্রস্তাব গভর্নর-জেনারেলের অনুমতি ব্যতীত প্রাদেশিক আইন-সভায় উত্থাপিত হইতে পারে না, তেমন কোন বিষয়ে গভর্নর জেনারেলের অনুমতি ব্যতীত গভর্নরের অর্ডিন্যান্স্ প্রবর্তনের অধিকার নাই। প্রাদেশিক আইন সভার অধিবেশন আরম্ভ হইবার ৬ সপ্তাহ পরে, অথবা ঐ আইন-সভা প্রত্যাখ্যান করা মাত্র, গভর্নরের অর্ডিন্যান্স্ বাতিল হইয়া যাইবে। (২) গভর্নরের নিজ বিবেচনাধীন "বিশেষ দায়িত্ব" পালনের জন্যও তিনি যে কোন সময়ে প্রয়োজনমত অর্ডিন্যান্স্ প্রয়োগ করিতে পারিবেন। উহা ৬ মাসকাল স্থায়ী হইবে। পরে আরও ৬ মাস উহা কার্যকরী রাখা যাইতে পারে, কিন্তু সেরূপ করিতে হইলে, পার্লামেণ্টকে জানাইবার জন্য ইহা ভারত-সচিবের নিকট পাঠাইতে হইবে। এইরূপ অর্ডিন্যান্স প্রবর্তনের পূর্বে গভর্নর-জেনারেলের সম্মতি লওয়া আবশ্যক। গভর্নর-জেনারেলের পূর্ব সম্মতি গ্রহণ সম্ভবপর না হইলেও গভর্নর ইহা প্রয়োগ করিতে পারেন, কিন্তু সে অবস্থায় গভর্নর জেনারেল অসম্মতি জানাইলেই গভর্নরকে ইহা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

সকল অর্ডিন্যান্সই আইন-সভার আইনের মত কার্যকরী হইবে। সম্রাট্ যে কোন অর্ডিন্যান্স বাতিল করিতে পারিবেন এবং গভর্নরেরও যে কোন অর্ডিন্যান্স্ প্রত্যাহারের অধিকার থাকিবে।

শাসনতন্ত্র বিকল্প ব্যবস্থা:—শাসনতন্ত্রের সাধারণ বিধানমত প্রাদেশিক শাসন পরিচালনা অসম্ভব হইলে, গভর্নর জেনারেলের সম্মতি লইয়া গভর্নর ঘোষণা (Proclamation) প্রচার করিয়া নিজহস্তে

প্রাদেশিক শাসন-ভার গ্রহণ করিতে পারিবেন। * অবশ্য, হাইকোর্টের কোন ক্ষমতাই তিনি খর্ব করিতে পারিবেন না। এইরূপ ঘোষণা অবিলম্বে পার্লামেণ্টের অবগতির জন্য ভারত সচিবকে জানাইতে হইবে এবং ৬ মাস পরে বাতিল হইয়া যাইবে। পার্লামেণ্ট অনুমোদন করিলে ইহা আরও ১ বৎসর কার্যকরী হইবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই এইরূপ ঘোষণা একাদিক্রমে ৩ বৎসরের বেশি বলবৎ থাকিবে না। ঐ সময়ের মধ্যে প্রয়োজনমত শাসন-ব্যবস্থার অদল-বদল করিয়া লইতে হইবে।

* ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হিটলার-শাসিত জার্মেনী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স তাহাদের মিত্র পোল্যাণ্ডের সাহায্যার্থ জার্মেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ভারতের জাতীয় রাষ্ট্র-মহাসভা (Indian National Congress) তখন এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও ভারতের প্রতি ব্রিটিশ মনোভাব সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের সুস্পষ্ট অভিমত জানিতে চাহেন। ভারতবর্ষকে অনতিবিলম্বে ঔপনিবেশিক মর্যাদা (Dominion status) ও স্বাধীনতা দেওয়া হইবে কি না রাষ্ট্র-মহাসভার এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধাবসানে ভারত-শাসন সংস্কার সম্পর্কে পুনর্বিবেচনার আশ্বাস দেন, কিন্তু ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান এজন্য আবশ্যক বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

বর্তমান যুদ্ধারম্ভে ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভা প্রাদেশিক শাসনে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপে ও ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ সম্পর্কিত মনোভাবের প্রতিবাদ স্বরূপ কংগ্রেস দল শাসিত প্রদেশে মন্ত্রিমণ্ডলকে পদত্যাগ করিতে নির্দেশ দেন। রাষ্ট্র-মহাসভার মতে ভারতকে স্বাধীনতা দানের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোন সম্পর্কই ছিল না, থাকিতেও পারে না। এই ভাবে, যে আটটি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীত্ব চলিতেছিল, তথাকার মন্ত্রিসভাসমূহ একে একে পদত্যাগ করেন। ঐ সকল প্রদেশের গভর্নরগণ তখন স্থায়ী মন্ত্রি-সভা গঠনে সমর্থ ও সম্মত ব্যক্তির অভাবে উপরিউক্ত বিধান অনুযায়ী ঘোষণা প্রচার করিয়া নিজ নিজ প্রদেশের শাসন-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের শাসন-কার্যে সাহায্য ও পরামর্শ দানের জন্য তাঁহারা এক বা কতিপয় উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীকে লইয়া পরামর্শ-দাতা (Advisors) নিযুক্ত করেন।

পরিশিষ্ট

(ক) সাধারণ শাসন-বহির্ভূত অঞ্চল

(Excluded Areas)

ব্রিটিশ ভারতের কতিপয় অঞ্চল "অনুন্নত অঞ্চল" (Backward Tracts)-রূপে পরিগণিত। ইহাদের কতকগুলিকে পূর্ণ-বহির্ভূত অঞ্চল এবং কতকগুলিকে আংশিক বহির্ভূত অঞ্চল বলা হয়। ইহারা ভারতের কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইন-সভার কর্তৃত্বের বাহিরে ন্যস্ত বলিয়াই ইহাদিগকে সাধারণ শাসন-বহির্ভূত অঞ্চল বলা হইয়া থাকে।

বর্তমান আইনে ব্যবস্থা হইয়াছে যে, গভর্নর এই সকল পূর্ণ বা আংশিক বহির্ভূত অঞ্চলে কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক আইন-সভার আইন প্রয়োগ বন্ধ করিতে পারিবেন। পূর্ণ-বহির্ভূত অঞ্চল গভর্নর স্বেচ্ছামত শাসন করিবেন; আইন-সভায় উহার কোন প্রতিনিধি থাকিবে না। আংশিক-বহির্ভূত অঞ্চল মন্ত্রীরা শাসন করিবেন এবং আইন-সভায় উহার প্রতিনিধি থাকিবে; কিন্তু গভর্নর ইহার শাসন ও আইনে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন। কেননা, পূর্ণ ও আংশিক-বহির্ভূত অঞ্চলের শাসন গভর্নরের অন্যতম "বিশেষ দায়িত্ব"। এই উভয় শ্রেণীর স্থান শাসনের ব্যয় সম্বন্ধে আইন-সভার ভোটাধিকার নাই।

ভারতের আদিম অধিবাসীরা যে সকল অঞ্চলে বাস করে, তাহাদের মধ্যে ৮টি স্থানকে পূর্ণ-বহির্ভূত অঞ্চল এবং ২৮টি স্থানকে আংশিক-বহির্ভূত অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। স-কাউন্সিল সম্রাট্ অবশ্য পূর্ণ-বহির্ভূত অঞ্চল এবং আংশিক-বহির্ভূত অঞ্চলকে সাধারণ শাসনাধীন স্থানে পরিণত করিতে পারিবেন। চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল, আসাম ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সীমান্তবর্তী স্থান এবং ভারতীয় সমাজ-

বিচ্যুত কতিপয় দ্বীপ পূর্ণ-বহির্ভূত অঞ্চলরূপে নির্দেশিত হইয়াছে। মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাংলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, আসাম এবং উড়িষ্যাতে আংশিক-বহির্ভূত অঞ্চল রহিয়াছে। বাংলায় দার্জিলিং জেলা ও ময়মনসিংহের সেরপুর ও সুসঙ্গ পরগণা; আসামে গারো পাহাড় জেলা, (শিবসাগর ও নওগাঁও জেলার) সিকিম পাহাড় এবং খাসি-জৈন্তিয়া জেলার শিলং ব্যতীত ব্রিটিশ ভূভাগ আংশিক-বহির্ভূত অঞ্চল।

এইরূপে বর্তমান আইনে সমগ্র ভারতে (১) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন, (২) সাধারণ প্রাদেশিক শাসন, (৩) পূর্ণ ও আংশিক-বহির্ভূত অঞ্চলের শাসন, (৪) গভর্নর জেনারেলের অধীনে চীফ্-কমিশনার-শাসিত অঞ্চলের শাসন এবং (৫) দেশীয় নৃপতিদের শাসন—এই পাঁচ শ্রেণীর বিভিন্ন শাসনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

(খ) সাময়িক ব্যবস্থা (Transitional Provisions)

১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু কেন্দ্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন প্রবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, ১৯১৯ সনের আইন অনুসারেই কেন্দ্রীয় শাসন পরিচালিত হইবে। তবে, গঠন হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্বের মতই একরাষ্ট্রীয় (unitary) থাকিলেও, ক্ষমতার দিক দিয়া ইহা প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অনুরূপই পরিচালিত হইবে। যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনের পূর্বেও ভারত-সচিবের প্রাদেশিক বিষয়ে পূর্বের ক্ষমতা থাকিবে না; অবশ্য কেন্দ্রীয় কর্ম-নির্বাহক সভা ও আইন সভা ভারত সচিবের কর্তৃত্বাধীনেই থাকিবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কার্যকরী হইবার পূর্বেই যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারি কর্মচারি নির্বাচন কমিশন (Federal Public Service Commission) প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহাদের কার্য আরম্ভ করিয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়

যুক্তরাষ্ট্র ও দেশীয় রাজ্যসমূহ

ব্রিটিশ-ভারতীয় প্রদেশসমূহ এবং দেশীয় রাজ্য লইয়া প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে, একথা আগেই বলা হইয়াছে। কিন্তু (১) দেশীয় রাজ্যসমূহের অন্তত অর্ধেক জনসংখ্যাবিশিষ্ট এবং (২) যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভার উর্ধ্ব পরিষদে দেশীয় রাজ্যের প্রাপ্য অর্ধেক সভ্য সংখ্যার অধিকারী করদ ও মিত্র রাজ্য যোগদান না করিলে, যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তিত হইবে না। যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশেচ্ছু দেশীয় নরপতিগণ প্রত্যেকে একটি **যুক্তরাষ্ট্র প্রবেশ-লিপি** (Instrument of Accession) বা সর্তনামা দাখিল করিবেন। যুক্তরাষ্ট্রের কি কি আইন-কানুন তাঁহাদের রাজ্যে কার্যকরী হইবে এবং যুক্তরাষ্ট্র ও তাঁহাদের রাজ্যের মধ্যে কি সম্বন্ধ থাকিবে, তাহা এই সর্তনামায় উল্লেখ করিতে হইবে। সর্তনামা অনুসারে কোন রাজ্যকে যুক্তরাষ্ট্রে গ্রহণ করা-না-করা সম্রাটের ইচ্ছাধীন। একবার যোগদান করিলে কোন রাজ্যই কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক ছিন্ন করিতে পারিবে না। আবার, যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনের ২০ বৎসর পরে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভার অনুরোধ ব্যতীত সম্রাট্ কোন দেশীয় রাজ্যকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করিতে দিবেন না। এই ব্যবস্থামত যে সকল দেশীয় রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করিবে না, তাহারা পূর্ববৎ সম্রাটের কর্তৃত্বাধীনে নিজ রাজ্য শাসন করিতে থাকিবে।

যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী রাজন্যবৃন্দ যে সকল শাসন-বিষয় যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে অর্পণ করিবেন, তাহা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে সম্রাটের সহিত তাঁহাদের পূর্ব সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এই জন্যই **সম্রাটের প্রতিনিধি** (His Majesty's Representative) নামে এক বিশেষ পদ সৃষ্ট

হইয়াছে। অবশ্য, গভর্নর-জেনারেল ও সম্রাটের প্রতিনিধি সাধারণত একই ব্যক্তি হইবেন। তিনি সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে রাজ্যসমূহের যুক্তরাষ্ট্র-বহির্ভূত বিষয় পরিচালনা এবং যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে দেশীয় রাজ্যসমূহের সহিত সম্রাটের সম্বন্ধ রক্ষা করিবেন। আবার, গভর্নর-জেনারেল হিসাবে, তিনি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয় সমূহ পরিচালিত করিবেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, দেশীয় রাজ্য ও ব্রিটিশ প্রদেশসমূহ এই একই যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হইলেও, তাহাদের গঠন ও অধিকারে অসাধারণ পার্থক্য থাকিবে। * রাজ্যসমূহে আজিও অল্পাধিক স্বেচ্ছাতান্ত্রিক শাসন বর্তমান; ব্রিটিশ প্রদেশে গণতান্ত্রিক শাসন চলিলেও, দেশীয় রাজ্যে উহা প্রবর্তিত হইবার তেমন কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। এমন কি, যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পিত বিষয়ও রাজারা নিজেরা পরিচালন করিতে পারিবেন; অবশ্য, সে সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রবেশ-লিপিতে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভায় প্রাদেশিক প্রতিনিধিগণ **নির্বাচিত** হইলেও, দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিবর্গ রাজা কর্তৃক **মনোনীত** হইবেন।

আইন-সভায় প্রতিনিধিত্ব—যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভায় ব্রিটিশ প্রদেশ সমূহের মত, যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী রাজ্যসমূহেরও প্রতিনিধি থাকিবেন। আইন-সভার **উর্দ্ধ পরিষদে** (Council of State) এই সকল দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি থাকিবে ১০৪ জন, কিন্তু সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের মাত্র ১৫৬ জন প্রতিনিধি থাকিবে। পূর্বোক্ত ১০৪টি সভ্যপদ বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে রাজাদের **মর্যাদা ও সম্মানসূচক প্রাপ্য তোপধ্বনি** অনুসারে বিভক্ত হইয়াছে। ক্ষুদ্রতর রাজ্যসমূহ কিন্তু **সম্মিলিতভাবে** প্রতিনিধি পাঠাইবে। এই ব্যবস্থায় হায়দ্রাবাদ ৫টি, মহীশূর, কাশ্মীর, গোয়ালিয়র ও বরোদা প্রত্যেক

* প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩টি করিয়া, কুচবিহার ১টি এবং ত্রিপুরা ও মণিপুর একত্রে ১টি সভ্যপদ পাইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভার **নিম্ন পরিষদে** (House of Assembly) দেশীয় রাজ্যসমূহের জন্য ১২৫ এবং ব্রিটিশ ভারতের ২৫০টি সভ্যপদ নির্দিষ্ট হইয়াছে। প্রধানত **লোকসংখ্যার অনুপাতেই** বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে এই ২৫০টি সভ্যপদ ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। হায়দারাবাদ লোকসংখ্যার (১৪৪ লক্ষ) অনুপাতে সভ্যপদ পাইয়াছে ১৬টি, মহীশূর (৮৫ লক্ষ) ৭টি, কাশ্মীর (৩৬ লক্ষ) ৪টি, গোয়ালিয়র (৩৫ লক্ষ) ৪টি ও বরোদা (২৪ লক্ষ) ৩টি; কিন্তু কুচবিহার (৫ লক্ষ), ত্রিপুরা (৩ লক্ষ) ও মণিপুর (৪ লক্ষ) ১টি করিয়া সভ্যপদ পাইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভায় দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিরা কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রীও হইতে পারিবেন।

লোকসংখ্যা এবং যুক্তরাষ্ট্রে দেয় রাজস্বের তুলনায় রাজ্যসমূহ যে প্রদেশ-সমূহ হইতে অনেক বেশি সুবিধা পাইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। মোটামুটি যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থায় দেশীয় রাজ্যসমূহ অনেক পরিমাণে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান নিয়ামক ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অধীন হইয়া পড়িবে। ইহা ছাড়া, ভবিষ্যতে ভারত-শাসনের ব্যবস্থায় প্রগতিশীল সংস্কারের পথে রাজন্যবৃন্দ বিঘ্ন সৃষ্টি করিবেন, এমন আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। ব্রিটিশ ভারতের মত রাজ্যসমূহেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হইলে এবং ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশ ও রাজ্যসমূহকে সমান ক্ষমতা ও অধিকার প্রদান না করিলে, ইহাদের লইয়া যথার্থ যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনা সম্ভব হইতে পারে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আর্থিক ব্যবস্থা

"এ যুগের নব পলিটিক্যাল্ সমস্যা একটু তলিয়ে দেখ্‌লেই দেখা যায়, সবই বর্ণচোরা ইকনমিক্ সমস্যা"।

—প্রমথ চৌধুরী (বীরবল)।

পূর্ব ইতিহাস—সিপাহি বিদ্রোহের পরে ব্রিটিশ সরকার ভারত-শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করিলে, আয়-ব্যয়ের সুসমঞ্জস ব্যবস্থা-বিধান তাঁহাদের অন্যতম প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। অবশ্য, ক্রমে সমস্ত প্রদেশেরই আয়-ব্যয়ের সুব্যবস্থা হয়। প্রথমে, কেন্দ্রীয় সরকারই সমগ্র ব্রিটিশ ভারতীয় রাজস্বের একমাত্র মালিক ছিলেন। স-পরিষদ গভর্নর-জেনারেলের অনুমতি ব্যতীত ঐ ভাণ্ডার হইতে এক কপর্দকও ব্যয় হইতে পারিত না। প্রাদেশিক সরকারসমূহের তখন কোন আর্থিক ক্ষমতাই ছিল না, তাই তাঁহারা নূতন কোন ব্যয় মঞ্জুর করিতেও পারিতেন না। ফলে, নানাপ্রকার অসুবিধা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। কেন না, বিভিন্ন প্রদেশ সম্পর্কে তেমন কোন অভিজ্ঞতা না থাকায়, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে কোন্ প্রদেশে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন, তাহা যথাযথভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হইত না। অন্য দিকে, কোন আর্থিক দায়িত্ব ছিল না বলিয়া, প্রাদেশিক সরকারসমূহও রাজস্বের উন্নতি ও শৃঙ্খলা বিধান সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। এই জন্যই ১৮৭১ সন হইতে প্রাদেশিক সরকারকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। এই অর্থের অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রাদেশিক সরকারকে নিজ প্রদেশে ছোটখাট ট্যাক্স্ বসাইবার ক্ষমতাও দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থায় ক্রমে ভূমিকর, স্ট্যাম্প্, আবগারি ইত্যাদি রাজস্ব অংশত প্রাদেশিক সরকারের হাতে দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিস,

পূর্ত, শিক্ষা, জেল, রাস্তাঘাট ও বিচার প্রভৃতির পরিচালনা এবং উহাদের ব্যয়-নির্বাহের দায়িত্বও তাঁহাদের উপর ন্যস্ত হয়।

১৯১৯ সালে **মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড-সংস্কার** প্রবর্তিত হইলে, ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থার জন্য স্যর্ (পরে, লর্ড) জেম্‌স্ মেস্টনের সভাপতিত্বে ১৯২০ সনে এক কমিটি নিযুক্ত হয়। এই কমিটি যে ব্যবস্থা সুপারিশ করেন তাহা **"মেস্টন্ বাঁটোয়ারা"** (Meston Settlement) নামে পরিচিত। এই "মেস্টন্ বাঁটোয়ারা" অনুসারে ব্রিটিশ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকার সমূহের জন্য আয়-ব্যয়ের নিম্নোক্ত ব্যবস্থা হয়:—

জেল, পুলিস, বিচার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প ইত্যাদি প্রাদেশিক দায়িত্ব পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের জন্য ভূমিকর (land revenue); আবগারি (excises) আয়; বন (forests) কর; বিচারসম্পর্কিত স্ট্যাম্প্ হইতে (stamps) আয় ও কতিপয় সেস্ (cess) **প্রাদেশিক সরকারকে** দেওয়া হয়। আবার ইংল্যাণ্ডের প্রাপ্য অর্থ (Home Charges), * জাতীয় ঋণ (debt charges), দেশ রক্ষার্থ (defence) সৈন্যবিভাগ, ডাকবিভাগ (Posts and Telegraph), ও সরকারি রেলওয়ে প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব সমূহ পালনের ব্যয় নির্বাহের জন্য লবণ-কর, অহিফেন-শুল্ক, বাণিজ্য-শুল্ক (customs), আয়কর (income tax), টাকশালের (currency and mint) আয় এবং ডাকবিভাগ ও রেলওয়ের আয় ইত্যাদি **কেন্দ্রীয় সরকারকে** দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া, মেস্টন্ কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় সংকুলানের জন্য প্রাদেশিক তহবিল হইতে কেন্দ্রীয় সরকারকে ভাতা (provincial

---

* Home charges—ভারত-সচিবের আপিসের ব্যয়, বিলাত হইতে গৃহীত ঋণের সুদ ও ভারত-সরকার কর্তৃক বিলাতে ক্রীত দ্রব্যাদির মূল্য

contributions) দিবার ব্যবস্থাও করেন। কিন্তু তাহা ১৯২৭ সনে রহিত করা হয়।

এইভাবে প্রাদেশিক সরকারসমূহ মূলত একই আর্থিক ব্যবস্থার অধীন হইল। পূর্বে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জন্য অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা হইত। "মেস্টন্ বাঁটোয়ারা"র ফলে মাদ্রাজ ও পাঞ্জাব প্রভৃতি কোন কোন প্রদেশের আর্থিক অবস্থা পূর্বাপেক্ষা স্বচ্ছল হইলেও, বাংলা এবং বোম্বাইয়ের মত প্রগতিশীল প্রদেশের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া উঠিল। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাই প্রবল জনমত গড়িয়া উঠে। বিশেষ করিয়া আয়-করের ভাগ যাহাতে প্রদেশগুলি পায়, সেজন্য প্রবল আন্দোলন দেখা দেয়।

মেস্টনী ব্যবস্থায় এইরূপে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের আয়-ব্যয় পৃথক করা হইল। ইতিপূর্বে প্রাদেশিক সরকারগুলির কোন ভিন্ন বাজেট (Budget) * ছিল না। সেই সময়কার একরাষ্ট্রীয় শাসনে প্রাদেশিক সরকারের শাসন-কার্যে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের সাধারণ অধিকার থাকিলেও, প্রদেশের নির্দিষ্ট রাজস্বে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ করার কোন ব্যবস্থা কার্যত ছিল না। কাজেই আর্থিক ক্ষেত্রে প্রদেশসমূহ তখন কার্যত যুক্তরাষ্ট্রাধীন প্রদেশের মতই স্বাধীন ছিল।

বর্তমান ব্যবস্থা—যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় প্রাদেশিক সরকারের রাজস্ব প্রভৃতি সকল ব্যাপারেই এই স্বাধীনতা আইন অনুসারে কায়েমি

* বাজেট বলিতে মোটামুটি সরকারি আয়-ব্যয়ের হিসাব বুঝায়। এই হিসাব রাজস্ব-সচিব কর্তৃক আইন-সভায় ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে উত্থাপিত হইয়া থাকে। বাজেট সাধারণ ৩ ভাগে বিভক্ত :—

(১) পূর্ব বৎসরের হিসাব-নিকাশ ; (২) চলতি বৎসরের হিসাব ও বাকি অংশের আনুমানিক আয়-ব্যয় ; এবং (৩) আগামী বৎসরের ব্যয় ও তাহা সংকুলানের জন্য প্রয়োজনমত ট্যাক্সের তারতম্য। ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত সরকারের আর্থিক বৎসর financial year) ধরা হয়।

হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয়, প্রাদেশিক ও যুগ্মাধিকারের অন্তর্গত বিষয়ের * আর্থিক দায়িত্বও এইরূপে যুক্তরাষ্ট্র এবং প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে বণ্টন করা হইয়াছে।

প্রাদেশিক আয়-ব্যয়ের নির্ধারিত বিষয়সমূহ ছাড়া কয়েকটি বিষয়ে ভাগাভাগির ব্যবস্থাও বর্তমান আইনে আছে, যথা :—(১) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার সমস্ত ব্রিটিশ প্রদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী দেশীয় রাজ্যের (কৃষিক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য) সম্পত্তির উপর উত্তরাধিকার-কর (succession duties), কতিপয় স্ট্যাম্প-কর রেলওয়ে বা এরোপ্লেনের মাল ও যাত্রীর উপর যাত্রাশেষে প্রান্ত (terminal) কর এবং রেলওয়ে ভাড়ার উপর ট্যাক্স ধার্য ও আদায় করিবেন। পরে, প্রদেশ ও রাজ্য-সমূহকে তাহাদের প্রাপ্য অনুসারে ঐ অর্থ ভাগ করিয়া দিবেন। যুক্তরাষ্ট্র নিজের জন্য এই সব বিষয়ে **অতিরিক্ত কর**ও বসাইতে পারিবে। (২) (কৃষি ভিন্ন অন্যান্য) আয়ের উপর যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এইরূপে আয়কর বসাইয়া ও আদায় করিয়া, উহা নিজ নিজ প্রাপ্য অনুসারে প্রদেশ ও রাজ্যসমূহকে দিয়া দিবেন। প্রয়োজনমত যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এই আয়কর হইতে কিয়দংশ রাখিতে পারিবেন; কিন্তু তাহার পরিমাণ ক্রমেই কমাইয়া আনিতে হইবে। যুক্তরাষ্ট্র নিজের প্রয়োজনে বর্ধিত হারেও (surcharge) আয়কর বসাইতে পারিবে। (৩) লবন-কর, যুক্তরাষ্ট্রীয় আবগারি কর ও বাণিজ্য-শুল্ক যুক্তরাষ্ট্র নির্ধারণ ও আদায় করিবে এবং ইচ্ছামত উহা সংশ্লিষ্ট প্রদেশ ও রাজ্যসমূহকে নিজ নিজ ভাগ অনুসারে অংশত বা সম্পূর্ণ দিতেও পারিবে। কিন্তু পাট-রপ্তানি শুল্কের অন্তত অর্ধেক ভাগ পাট উৎপাদনকারী প্রদেশ ও রাজ্যসমূহকে দিতেই হইবে।

নীমেয়ার রিপোর্ট—১৯৩৫ সনের ভারত-শাসন আইনে সাধারণ-ভাবে যে আর্থিক ব্যবস্থা আছে তাহার বিস্তারিত আলোচনা ও

* (৩য় অধ্যায় ; পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য)

যথাযোগ্য বণ্টন ব্যবস্থা পরে করা হয়। কতকগুলি রাজস্ব প্রথম হইতেই ভাগাভাগি হইবে ভারত-শাসন আইনেই ব্যবস্থা আছে। যথা, পাট রপ্তানি-শুল্ক (Jute Export Duty) ও আয়-কর (Income Tax) (কৃষিজাত আয়ের উপর ভিন্ন)। এই দুইটি রাজস্বের যথাযোগ্য বণ্টন, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের আর্থিক অবস্থা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় তহবিল হইতে প্রদেশবিশেষকে আর্থিক সাহায্য দান সম্পর্কে তদন্তের জন্য ব্রিটিশ সরকার স্যর্ অটো নীমেয়ার (Sir Otto Niemeyer)-কে বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিযুক্ত করেন। ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে তাঁহার মন্তব্য (Report) প্রকাশিত হয়। স্যর্ অটো নীমেয়ারের সুপারিশ অনুসারে ব্যবস্থা হয় যে,

(১) প্রথম ১০ বৎসর (কৃষি ভিন্ন অন্যান্য) আয়করের শতকরা ৫০ ভাগ যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাইবেন ; বাকি ৫০ ভাগ প্রদেশগুলির মধ্যে নিম্নোক্তভাবে বিভক্ত হইবে—বাংলা শতকরা ২০ ভাগ, বোম্বাই ২০, মাদ্রাজ ১৫, যুক্তপ্রদেশ ১৫, বিহার ১০, পাঞ্জাব ৮, মধ্যপ্রদেশ ৫, আসাম ২, উড়িষ্যা ২, সিন্ধু ২ এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ১ ভাগ।

১৯৩৯-৪০ সনে এই ব্যবস্থায় বাংলা-সরকার আনুমানিক ৩২ লক্ষ টাকা আয়কর পাইয়াছেন।

(২) পাট-রপ্তানী শুল্কের শতকরা ৬২½ ভাগ প্রদেশসমূহ পাইবে। বাংলা এই ব্যবস্থানুসারে বৎসরে প্রায় ২½ কোটি টাকা পাইতেছে।

(৩) ভারত-সরকারের কাছে প্রদেশসমূহের যে ঋণ ছিল, তাহা মকুব করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় ১৯৩৬ সালের ১লা এপ্রিল পর্যন্ত বাংলা, বিহার, আসাম, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং উড়িষ্যা প্রদেশের কেন্দ্রীয় সরকারের নিকটে যে ঋণ ছিল, তাহা দিতে হইবে না বলিয়া তাহাদের যথাক্রমে ৩৩ লক্ষ, ২২ লক্ষ, ১৫½ লক্ষ, ১২ লক্ষ, ১৫ লক্ষ এবং ৯½ লক্ষ টাকা প্রতি বৎসর বাঁচিয়া যাইবে।

মেস্টনী ব্যবস্থায় এতকাল প্রদেশসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্থ সাহায্য করিয়া আসিয়াছে। বর্তমান আইনে তাহা রহিত হইয়াছে। বরং কতিপয় প্রদেশ নিজ আয় দ্বারা ব্যয় সংকুলান করিতে পারিবে না মনে করিয়া, তাহাদের সাহায্যার্থে কেন্দ্রীয় তহবিল হইতে অর্থদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। *

প্রাদেশিক আয়-ব্যয়—মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড-সংস্কারের আমলে প্রাদেশিক আয়-ব্যয়ের যে ব্যবস্থা ছিল, বর্তমানেও মোটামুটি সেই ব্যবস্থাই রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে নীমেয়ার ব্যবস্থাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নূতন আইনে মোট ৫৪টি বিষয়ের পরিচালনা-ভার প্রাদেশিক সরকারের হাতে দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয় সমূহই প্রধান ; যথা—(শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থ) পুলিস ; (যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় ভিন্ন অন্যান্য) বিচারালয় ; জেল ; প্রাদেশিক ঋণ, চাকুরি ও পেন্‌শন্ ; প্রাদেশিক মন্ত্রী ও আইন-সভার সভাপতিদের বেতন ; স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন ; জনস্বাস্থ্য ; শিক্ষা ; রাস্তাঘাট প্রভৃতি পূর্ত বিভাগের কর্ম ; কৃষি ; জল নিকাশ ; ভূম্যধিকার ও ভূমি-রাজস্ব ; বন ; খনি ও তাহার কর ; প্রাদেশিক বাণিজ্য, শিল্পোন্নয়ন, কর্পোরেশন গঠন, (মাদক দ্রব্যাদির উপর ধার্য) আভ্যন্তরীণ আবগারি কর ; কৃষির উপর আয়কর ; মাথাপিছু ট্যাক্স (capitation tax) ; যৌথ ব্যবসাদির উপর ধার্য ট্যাক্স (corporation tax) ; (যুক্তরাষ্ট্রীয় স্ট্যাম্প্ ভিন্ন) স্ট্যাম্প্-ডিউটি † ইত্যাদি। এই সমস্ত বিষয়ের আয়-ব্যয় প্রাদেশিক সরকারের।

* যুক্তপ্রদেশ, আসাম, উড়িষ্যা, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে এই অর্থ সাহায্য করা হইবে।

† যুক্তরাষ্ট্রীয় স্ট্যাম্প্ ডিউটি—বিনিময় পত্র (Bill of Exchange), চেক্, হাতচিঠা (promissory note), মালখালাস পত্র (Bill of Lading) প্রেরকের (বাণিজ্যবিষয়ক) ঋণ পত্র (letters of credit), জীবনবীমা-পত্র (Insurance Policy) ইত্যাদির স্ট্যাম্প্-ডিউটি।

বাংলা সরকারের ১৯৩৯ ৪০ সনের আনুমানিক আয়-ব্যয়ের হিসাব :—

আয়

(ক) প্রধান আয় :—		
ভূমি-রাজস্ব	...	৩, ৯৩ লক্ষ টাকা
আভ্যন্তরীণ আবগারি-কর	...	১, ৫৭ „ „
প্রাদেশিক স্ট্যাম্প্ কর	...	২, ৫৬ „ „
বাণিজ্য শুল্ক (পাট-রপ্তানি)	...	২, ৩০ „ „
আয়-কর	...	০, ৩২ „ „
বন-কর	...	০, ২২ „ „
রেজিস্ট্রেশন্ ফি	...	০, ২২ „ „
প্রমোদ ও অন্যান্য কর	...	০, ৫৯ „ „
(খ) অন্যান্য আয়	..	১, ২৯ „ „
(গ) পূর্ববৎসরের উদ্বৃত্ত	..	০, ৭৮ „ „
মোট		১৩, ৭৮ লক্ষ টাকা।

ব্যয়

(ক) প্রধান ব্যয়		
পুলিস	..	২, ৩২ লক্ষ টাকা
সাধারণ শাসন	...	১, ৫৮ „ „
বিচার	...	১, ০২ „ „
জেল	...	০, ৩৫ „ „
শিক্ষা	...	১, ৫৭ „ „
জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা	...	১, ০৭ „ „
কৃষি, শিল্প ও পশুচিকিৎসা	...	০, ৩৯ „ „
পথঘাট ও সরকারি গৃহাদি নির্মাণ ও মেরামত	...	১, ৫৯ „ „
পেন্‌শন্	...	১, ০১ „ „
দুর্ভিক্ষ সাহায্য		০, ০৪ „ „
(খ) অন্যান্য ব্যয়	...	৩, ৬৯ „ „
মোট		১৪, ৬৫ লক্ষ টাকা।

বাংলার লোক-সংখ্যা প্রায় ৫২ কোটি, আর রাজস্ব (সরকারি আয়) মোটামুটি ১৪ কোটি। জন-সংখ্যা ও আয়তনের অনুপাতে বাংলার রাজস্ব অল্পই বলিতে হইবে। ব্যয়-অনুপাতে রাজস্বের ঘাটতি বার্ষিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশের **ভূমি-রাজস্বই** প্রধান আয়। বাংলাদেশের শিল্পের প্রসার তেমন আশানুরূপ নহে। বাংলার রাজস্ব এত কম হওয়ার ইহা অন্যতম প্রধান কারণ।

প্রাদেশিক সরকারসমূহের প্রধান ব্যয় **পুলিসের খরচ**। বলা বাহুল্য, শিক্ষা, সেচ ও জনসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতি এবং ভূমি-কর বা খাজনা ও কৃষি-ঋণ হ্রাস প্রভৃতি কার্যাদি সম্পাদনের মত পর্যাপ্ত অর্থ প্রাদেশিক সরকারের নাই। অথচ, উপরিউক্ত কার্যগুলি দেশ-দেশবাসীর সমৃদ্ধির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারিদের বেতন ও ভাতা হ্রাস প্রভৃতির উপরই সরকারি ব্যয়-হ্রাস বিশেষভাবে নির্ভর করে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তাহা কমান সম্ভব হয় নাই। কাজেই, গঠন-মূলক কার্যাদি প্রয়োজনের তুলনায় খুব অল্পই সম্পাদিত হইতে পারে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (Reserve Bank)—যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রা ও নোট প্রচলন এবং সরকারি টাকা লেনদেনের জন্য ১৯৩৫ সনে অংশীদার সম্বলিত এক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গভর্নর-জেনারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্মসচিব (Governor) ও দুইজন সহকারী কর্মসচিব (Deputy Governor) নিয়োগ করেন। ইঁহাদের নিয়োগ, পদচ্যুতি, বেতন ও কার্যকাল এবং ব্যাঙ্কের দেনা-পাওনা মিটাইয়া উহার কার্য-পরিচালনা বন্ধকরণ (liquidation) সম্পর্কে গভর্নর-জেনারেল নিজ বিবেচনামত কার্য করিবেন। মুদ্রাপ্রস্তুত (coinage), অর্থপ্রচলন (currency) এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত কোন আইনই গভর্নর-জেনারেলের সম্মতি ব্যতীত প্রস্তাবিত হইতেও পারিবে না। স-কাউন্সিল রাজ্য ভারত ও ব্রহ্মের মুদ্রাদি প্রচলন সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

উক্ত কর্মসচিব, সহকারি কর্মসচিব, ১২ জন সভ্য (Director) এবং ১ জন সরকারি কর্মচারি লইয়া একটি "কেন্দ্রীয় পরিচালক-সমিতি" (Central Board of Directors) গঠিত হয়। ব্যাঙ্কের সাধারণ কার্যাদি পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করাই ইহার কর্তব্য। এই ১২ জন সভ্যের (Director) মধ্যে ৪ জন গভর্নর-জেনারেল কর্তৃক মনোনীত এবং ৮ জন অংশীদারবর্গ দ্বারা নির্বাচিত।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কের প্রসার, নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রা ও নোটের প্রচলন, সরকারের ব্যাঙ্কার হিসাবে যাবতীয় কাজ যথা—টাকার লেনদেন, প্রভৃতি—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দায়িত্ব।

সম্রাট্ ও দেশীয় রাজ্যের আর্থিক সম্পর্ক—দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে সম্রাটের কর্তব্যসমূহ পালনের উদ্দেশ্যে সম্রাট্-প্রতিনিধি যে অর্থ চাহিবেন, যুক্তরাষ্ট্রকে তাহা দিতে হইবে। করদ রাজ্য কর্তৃক দেয় কতিপয় কর সম্রাট্ পূর্ববৎ কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলে জমা দিবেন; তিনি ঐ কর মাপ করিতেও পারিবেন। অবশ্য, প্রদেশসমূহ উপরি উক্ত ব্যবস্থামত যুক্তরাষ্ট্রীয় তহবিল হইতে আয়করের অংশ না পাওয়া পর্যন্ত, দশীয় রাজ্যের দেয় অর্থ মকুব হইবে না। এই আইনের পূর্বে স-কাউন্সিল গভর্নর জেনারেল বা কোন প্রাদেশিক সরকার রাজ্যবিশেষকে কোন অর্থ দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া থাকিলে, উহা যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক ধন-ভাণ্ডার হইতে দেওয়া হইবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার দেশীয় রাজ্যকে কোন অর্থ দিলে, রাজ্যের অন্যবিধ প্রাপ্য সেই পরিমাণে কমান যাইবে। যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী রাজ্যসমূহের নিকট হইতে কেন্দ্রীয় সরকার আর পূর্বের মত কর পাইবেন না।

কোন দেশীয় রাজ্য-সম্পত্তির (কৃষিতে নিযুক্ত জমি ভিন্ন) উত্তরাধিকার-কর, রেলওয়ে বা এরোপ্লেনের মাল ও যাত্রীর উপর যাত্রাশেষে প্রান্তীয় (terminal) কর, রেলওয়ে ভাড়ার উপর ট্যাক্স,

আয়কর ইত্যাদি যুক্তরাষ্ট্রকে দিতে অসম্মত হইলে, ঐ রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রকে ঐ পরিমাণে অর্থ দিবে।

যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনের ১০ বৎসরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কোন রাজ্যের যৌথব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের উপরে ট্যাক্স (Corporation Tax) বসাইতে পারিবেন না। ১০ বৎসর পরে ঐরূপ ট্যাক্স ধার্য হইলেও, সকল রাজ্যই ঐ ট্যাক্সের পরিবর্তে সমপরিমাণ অর্থ যুক্তরাষ্ট্রকে দিতে পারিবে। *

বর্তমান আইনে দেশীয় রাজ্যে যে সকল যুক্তরাষ্ট্রীয় ট্যাক্স বসিবার কথা আছে, তাহা ছাড়া অন্যান্য ট্যাক্স সম্বন্ধে তাহাদের পূর্ব অধিকারই অক্ষুন্ন থাকিবে। এই প্রকার ব্যবস্থায় প্রদেশের তুলনায় দেশীয় রাজ্যগুলির আয়ের ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত।

ভারতের সরকারি ঋণ † (Public Debt)—সরকারের ঋণকেই জাতীয় ঋণ বলা হয়। ব্যক্তি বিশেষের মত সরকারেরও আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হইতে পারে; এইরূপ অবস্থাতেই ব্যয় নির্বাহের জন্য ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। জাতীয় ঋণ **আভ্যন্তরীণ** (internal) বা **বৈদেশিক** (external) অথবা উভয়বিধ হইতে পারে। এই ঋণ আবার দুই রকমের—উৎপাদনশীল (productive) ও অনুৎপাদনশীল (unproductive)। যে ঋণ প্রাত্যহিক ব্যয় নির্বাহের জন্য

* দেশীয় নৃপতিগণ স্বীয় রাজ্যে যুক্তরাষ্ট্রকে এই প্রকার কর বসাইতে দিতে অস্বীকৃত. তাই এই ব্যবস্থা হইয়াছে।

† ভারতের অন্যতম প্রদেশ থাকা কালে ব্রহ্মদেশের জন্য ভারত-সরকার যে সকল ব্যয় করিয়াছেন, এই আইনে তাহা অংশত ফেরৎ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারত-সরকারের নিকট এই বাবদে ব্রহ্ম-দেশের ঋণ প্রায় ৫২ কোটি টাকা ধার্য হইয়াছে। উহা ৪৫ বৎসরে পরিশোধ করা হইবে।

প্রয়োজন হয় এবং যাহা হইতে ভবিষ্যতে লাভের কোন সম্ভাবনা থাকে না তাহাকে **অনুৎপাদনশীল** ঋণ বলা হয়। এইরূপ ঋণে শুধু দেশের ভারই বৃদ্ধি পায়। আর, যে ঋণ কোন গঠনমূলক কার্যে প্রয়োগ করা হয় এবং যেখানে ঋণ শোধের পরেও আয় হইয়া থাকে, তাহাকে বলে **উৎপাদনশীল** ঋণ।

পূর্ব ইতিহাস—ভারতবর্ষে জাতীয় ঋণের সূচনা হয় ঈস্ট্-ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে। যুদ্ধ-বিগ্রহাদিতে কোম্পানির যে ঋণ হয়, ভারত-শাসন ব্রিটিশ সরকারের নিকট হস্তান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ঋণ-ভারও হস্তান্তরিত হইল। ১৮৫৭ সালে কোম্পানির ঋণ ছিল প্রায় ৫২ লক্ষ পাউণ্ড; কিন্তু সিপাহি বিদ্রোহের পরে উহা ৯২ লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়ায়। ব্রিটিশ শাসনে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৮৭৭ সালের দুর্ভিক্ষ পর্যন্ত ১৪৩½ লক্ষ পাউণ্ড হয়। এই সকল ঋণ প্রায় সম্পূর্ণই অনুৎপাদনশীল এবং বৈদেশিক।

১৮৭৭ সালের দুর্ভিক্ষের পরেই ভারত-সরকার রেলওয়ে নির্মাণ, পূর্তকর্ম, দুর্ভিক্ষ নিবারণ প্রভৃতি কার্যে হাত দিলেন। ইহার জন্য বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই ভাবে ১৯১৪ সন পর্যন্ত জাতীয় ঋণের পরিমাণ ৪১১ কোটি টাকা হয়। অবশ্য, ইহার অধিকাংশই ছিল উৎপাদনশীল ঋণ। ঐ বৎসরে উৎপাদনশীল ঋণের সুদের পরিমাণ ছিল ১৩ কোটি টাকা এবং অনুৎপাদনশীল ঋণের মাত্র ১ কোটি টাকা।

বিগত মহাযুদ্ধে ভারত-সরকার ব্রিটিশ সরকারকে ১৫০ কোটি টাকার অর্থ সাহায্য করেন। ইহাও ভারতের অনুৎপাদনশীল ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহার পর নয়াদিল্লী নির্মাণ, ভিজাগাপটম্ বন্দর সৃষ্টি প্রভৃতির জন্যও খরচ হয়। তাহার উপরে যুদ্ধাবসানে বিশ্বময় আর্থিক দুর্দশা দেখা দিল। ফলে, অনুৎপাদনশীল ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমানে জাতীয় ঋণ মোট ১,২০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

গত যুদ্ধের পর হইতে ভারতের বৈদেশিক ঋণ হইতে আভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্তমান যুদ্ধের পূর্বে মোটামুটি হিসাবে ঋণের ৪৫০ কোটি টাকা ছিল বৈদেশিক ও ৮৭৫ কোটি টাকা আভ্যন্তরীণ; তন্মধ্যে প্রায় ১৭৫ কোটি অনুৎপাদনশীল।

এই ঋণ শোধ করিবার জন্য সরকার প্রতি বৎসর একটি বিশেষ ফণ্ডে প্রায় তিন কোটি টাকা করিয়া জমা করেন।

ঋণগ্রহণ ব্যবস্থা—বর্তমান আইন অনুসারে ভারত-সচিব পূর্বের মত আর ভারত-সরকারের জন্য ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠার পর যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি মাত্র বিলাতে স্টার্লিং লোন গ্রহণ করিতে পারিবেন। যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তিত হইলে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারই যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভার নির্দেশ মত ভারতের জাতীয় ঋণ পরিচালনা করিবেন।

প্রাদেশিক সরকারও নিজ দায়িত্বে প্রদেশিক আইন-সভার নির্দেশ মত ঋণ গ্রহণাদির ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। কিন্তু কেবল আভ্যন্তরীণ ঋণ সম্পর্কেই প্রাদেশিক সরকারকে এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। বৈদেশিক ঋণ গ্রহণে প্রদেশসমূহকে যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতি লইতে হইবে। ইহা ছাড়া, প্রদেশবিশেষের যুক্তরাষ্ট্রীয় তহবিল হইতে গৃহীত ঋণ বা তাহার কোন অংশ অনাদায়ী থাকা পর্যন্ত, ঐ প্রদেশ যুক্তরাষ্ট্রের বিনা অনুমতিতে কোন প্রকার ঋণই আর গ্রহণ করিতে পারিবে না।

যুক্তরাষ্ট্রান্তর্গত দেশীয় রাজ্যকে যথাযোগ্য সর্তে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ঋণদান করিতে বা উহার ঋণের জন্য জামিন হইতে পারেন।

হিসাব পরীক্ষা (Audit)—যুক্তরাষ্ট্রের হিসাব পরীক্ষার জন্য সম্রাট্ একজন **অডিটর্ জেনারেল্** নিয়োগ করিবেন। অডিটর্-জেনারেল্ ও তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারিদের বেতনাদি যুক্তরাষ্ট্রই বহন করিবে। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্তনের ৫ বৎসর পরে

প্রাদেশিক আইন-সভার মত হইলে, সম্রাট্ প্রাদেশিক হিসাব পরীক্ষার জন্য জনৈক প্রাদেশিক অডিটর্-জেনারেলও নিযুক্ত করিতে পারিবেন। কর্ম-বিভাগ আইনমত ও ন্যায্যভাবে খরচ করিতেছেন কিনা, তাহা দেখিবার জন্যই নিরপেক্ষ স্বাধীন হিসাব পরীক্ষকের এই ব্যবস্থা হইয়াছে।

গভর্নর জেনারেলের মত লইয়া, অডিটর্-জেনারেল্ যুক্তরাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক হিসাব-পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। অডিটর্ জেনারেলের রিপোর্ট গভর্নর্-জেনারেল্ ও গভর্নর্ কর্তৃক যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং প্রাদেশিক আইন-সভার নিকট পেশ করা হইবে।

ভারত-সরকারের বিলাতে যে হিসাব থাকিবে, তাহা পরীক্ষার জন্য গভর্নর্-জেনারেল্ বিলাতে ভারত-সম্পর্কিত ব্যয়ের জনৈক হিসাব-পরীক্ষক (Auditor of Home Accounts) নিযুক্ত করিবেন ; ইনি ভারত-সরকারের অডিটর্ জেনারেলের অধীনস্থ কর্মচারী হইবেন।

সপ্তম অধ্যায়

বিচার-ব্যবস্থা

"ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হ'তে পারি তথা
তোমার আদেশে ; যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি' উঠে খর খড়্গসম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে ল'য়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা যেন তা'রে তৃণসম দহে।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (নৈবেদ্য, "ন্যায়দণ্ড")

গণতান্ত্রিক দেশে ভোটাধিকারী জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে আইন-সভাই (Legislature) রাজ্যশাসনের মূল রীতিনীতি বা আইন প্রণয়ন করে। আইন-সভার নির্দেশ মত কর্ম-বিভাগ (Executive) ঐ রীতি-নীতি বা আইন অনুসারে দেশ শাসন করে এবং ঐ আইন যথাযথ প্রতিপালিত হইতেছে কিনা, তাহা বিচার-বিভাগ (Judiciary) পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকে।

প্রিভি কাউন্সিল (Privy Council)—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সর্বোচ্চ বিচার-ক্ষমতা সম্রাটের হাতেই ন্যস্ত। ১৮৩৩ সনের এক আইন অনুসারে সম্রাটের এই বিচার-ক্ষমতা তাঁহার প্রিভি কাউন্সিলের **জুডিসিয়াল কমিটি** (Judicial Committee of the Privy Council) কর্তৃক পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। ইংল্যাণ্ডের চ্যান্সেলর্ ব্যতীত, লর্ড প্রেসিডেণ্ট, ভূতপূর্ব লর্ড প্রেসিডেণ্টগণ, ৬ জন আপীল বিচারক লর্ড, উচ্চ বিচারকপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন প্রিভি কাউন্সিলের

এইরূপ সভ্য এবং উপনিবেশসমূহ হইতে কয়েক জন ও ভারতবর্ষ হইতে সাধারণত ২ জন বেতনভোগী বিচারক লইয়া এই কমিটি গঠিত।

ইহা একটি কমিটি, কোর্ট নহে ; তাই ইহার সিদ্ধান্তকে রায় বলা হয় না, ইহা কেবল সম্রাটের নিকট **সুপারিশ** করিয়া থাকে। সম্রাটের নিকট আবেদনরূপেই জুডিশিয়াল কমিটিতে আপীল করা হয়। ভারতে কোন সুপ্রীম্ কোর্ট বা উচ্চতম বিচারালয় নাই। এই কমিটিই ভারতের সর্ব্বোচ্চ কোর্টরূপে বিচার পরিচালনা করে। সাধারণত প্রতি বৎসর ব্রিটিশ ভারতীয় হাইকোর্টের বিচারের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে প্রায় শতাধিক ফৌজদারি ও দেওয়ানি মোকদ্দমার আপীল গিয়া থাকে। *

এই বিচারালয়ে আপীল যেমন ব্যয়সাধ্য, তেমনি সময়-সাপেক্ষ। ভারতবাসীরা তাই ভারতে একটি সুপ্রীম্ কোর্ট প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ আগ্রহশীল। নূতন আইনে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত স্থাপনার ব্যবস্থা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভা এই আদালতে দেওয়ানি আপীলের ব্যবস্থা করিলে, প্রাদেশিক হাইকোর্ট হইতে প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতে ঐরূপ আপীল করিতে হইবে। অবশ্য, পরে তথা হইতে প্রিভি কাউন্সিলে ঐ মামলা সম্বন্ধে আপীল করা চলিবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে যে মোকদ্দমা হইবে, তাহার আপীলও প্রিভি কাউন্সিলে হইতে পারিবে।

দেশীয় রাজ্যসমূহ পার্লামেণ্ট ও প্রিভি কাউন্সিলের কর্তৃত্বের বাহিরে বলিয়া, এতকাল তথাকার হাইকোর্ট হইতে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল যায় নাই। যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিলে, তাহারা অনেকাংশে

---

* ১০,০০০ টাকা বা তদূর্ধ্ব দাবী সম্পর্কিত দেওয়ানি মোকদ্দমাতেই প্রিভি কাউন্সিলে আপীল চলে ; কিন্তু ফৌজদারি মামলার আপীল প্রাদেশিক হাইকোর্টের অনুমতি সাপেক্ষ।

পার্লামেণ্ট ও প্রিভি কাউন্সিলের ক্ষমতাধীন হইবে বটে, তথাপি ফৌজদারি ও দেওয়ানি আপীল সম্পর্কে পূর্ব ব্যবস্থাই অটুট্ থাকিবে। এমন কি, এই সকল দেশীয় রাজ্যের হাইকোর্ট হইতে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়েও দেওয়ানি বা ফৌজদারি মোকদ্দমার আপীল হইবে না। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কিত যে সকল শাসনতান্ত্রিক (constitutional) মামলা * হইবে, কেবল সেই সম্বন্ধেই প্রিভি কাউন্সিলে আপীল চলিবে। অবশ্য, ইহাতে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের অনুমতি প্রয়োজন হইবে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত (Federal Court)

একদিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এবং অন্যদিকে ব্রিটিশ প্রদেশ ও (যুক্তরাষ্ট্র যোগদানকারী) দেশীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা সম্বন্ধে সময় সময় মতবিরোধ ঘটিতে পারে। এই প্রকার মতবিরোধের মীমাংসার জন্য এক যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই আদালতই শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন বিধানসমূহের মর্ম ব্যাখ্যা করিয়া দিবে। †

এই আদালতে ৭ জন বিচারক থাকিতে পারিবেন ; তাঁহাদের মধ্যে ১ জন হইবে **প্রধান বিচারপতি**। ১৯৩৭ সনের ১লা অক্টোবর

* অর্থাৎ, নূতন শাসনতন্ত্রের বিধান, স-কাউন্সিলের রাজ-নির্দেশ এবং দেশীয় নৃপতিদের প্রবেশ-লিপি দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পিত ক্ষমতা সম্বন্ধীয় মোকদ্দমা।

† কিছুদিন পূর্বে মধ্যপ্রদেশের সরকার-কর্তৃক পেট্রোল বিক্রয়ের উপর কর ধার্যের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার আপত্তি করিয়াছিলেন। পরে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত বিধান দেন যে, শাসনতন্ত্র অনুসারে প্রাদেশিক সরকারের ঐ কর ধার্যের অধিকার রহিয়াছে। এইরূপ অনধিক দশটি মোকদ্দমার বিচার আজ পর্যন্ত হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত স্থাপিত হইয়াছে। ইহার প্রধান বিচারপতি হইয়াছেন স্যর্ মরিস্ গায়ার (Sir Maurice Gwyer) এবং স্যর্ মহম্মদ সুলেমান ও শ্রীযুক্ত মুকুন্দরাম জয়াকর *—এই ২জন মাত্র বিচারক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের বিচারকগণ সম্রাট্ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। ইঁহারা ৬৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত কার্য করিবেন। কিন্তু ক্ষমতার অপব্যবহার বা শারীরিক ও মানসিক অসামর্থ্যের জন্য জুডিশিয়াল্ কমিটির মতানুসারে ইঁহাদের পদচ্যুত করা চলিবে। শুধু নিম্নলিখিত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিই এই আদালতের বিচারক নিযুক্ত হইতে পারিবেন :—

(১) ব্রিটিশ ভারত বা যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী দেশীয় রাজ্যের হাইকোর্টের বিচারক (অন্তত ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকা চাই);

(২) ইংল্যাণ্ড বা উত্তর-আয়াল্যাণ্ডের ব্যারিস্টার অথবা স্কট্ল্যাণ্ডের এ্যাড্ভোকেট্ (অন্তত ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকা চাই);

(৩) ব্রিটিশ ভারত অথবা যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী দেশীয় রাজ্যের হাইকোর্টের আইন-ব্যবসায়ী (অন্তত ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকা চাই)।

কিন্তু ১৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যারিস্টার অথবা স্কট্ল্যাণ্ডের এ্যাড্ভোকেট্ বা উকিল না হইলে, কেহ স্থায়ী ভাবে এই আদালতের প্রধান বিচারকপদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। ইঁহাদের বেতন ও ছুটি প্রভৃতি স-কাউন্সিল রাজা কর্তৃক সাব্যস্ত হইবে। এই আদালতের বিচারকদের বেতনাদি ও অন্যান্য যাবতীয় ব্যয় যুক্তরাষ্ট্রীয় তহবিল হইতে দেওয়া হইবে।

---

* শ্রীযুক্ত জয়াকর প্রিভি কাউন্সিলে বিচারক নিযুক্ত হওয়ায়, তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত বরদাচারী বিচারক নিযুক্ত হইয়াছেন।

† প্রধান বিচারপতির মাসিক বেতন ৭ হাজার এবং অন্যান্য বিচারকদের প্রত্যেককে ৪½ হাজার টাকা দেওয়া হইবে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ও প্রিভি কাউন্সিল্ শাসনতন্ত্রের আইনসমূহের যে ব্যাখ্যা করিয়া দিবে, সকল আদালতকেই তাহা মানিয়া লইতে হইবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত দিল্লীতে বসিবে, তবে প্রধান বিচারপতি অন্যত্রও উহার অধিবেশনের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

এই আদালতের দুইটি বিভাগ থাকিবে—(১) প্রাথমিক বিচার বিভাগ ও (২) আপীল বিচার বিভাগ।

(১) **প্রাথমিক বিচার বিভাগ** (Original Jurisdiction)—যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার, যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী দেশীয় রাজ্য এবং ব্রিটিশ প্রদেশসমূহ—ইহাদের মধ্যে **শাসনতান্ত্রিক বিধান সম্পর্কে** কোন বিরোধ ঘটিলে, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের প্রাথমিক বিচার বিভাগে তাহার বিচার হইবে। * যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত শুধু **নির্দেশ** দিতে পারিবে এবং এই নির্দেশ শেষ মীমাংসারূপে গণ্য হইবে না। †

(২) **আপীল বিচার বিভাগ** (Appellate Jurisdiction)—ব্রিটিশ ভারতীয় হাইকোর্ট সমূহের বিচারের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত দুই শ্রেণীর মামলার আপীল এই যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের এলাকাধীন :—

(১) শাসনতান্ত্রিক বিধান বা তদন্তর্গত স-কাউন্সিল রাজ-নির্দেশ সংক্রান্ত বলিয়া হাইকোর্ট কর্তৃক ঘোষিত মামলা (প্রিভি কাউন্সিলে উহার সরাসরি আপীল চলিবে না) এবং (২) যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভার

* বিভিন্ন প্রদেশসমূহ অথবা প্রদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মাত্র শাসনতন্ত্র সম্বন্ধীয় বিরোধের বিচারই এই আদালতে হইবে। কিন্তু উহাদের ভিতরকার অন্যবিধ বিরোধ গভর্নর-জেনারেল কর্তৃক নিযুক্ত আন্তঃপ্রাদেশিক কাউন্সিল মীমাংসা করিবে।

† যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের সুপ্রীম্ কোর্টের অনুরূপ বিচারক্ষমতা নাই বলিয়াই উহার মাত্র **নির্দেশ** দিবার অধিকার আছে।

বিধান অনুসারে নির্দিষ্ট কতিপয় **দেওয়ানি** মামলা (কিন্তু এই সকল মামলার দাবীর মূল্য অন্তত ১৫ হাজার টাকা হওয়া চাই)।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভা প্রাদেশিক হাইকোর্টের এই সব দেওয়ানি আপীলের বিচারের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের আপীল বিভাগে এক শাখাও যোগ করিয়া দিতে পারিবে। এইরূপ ব্যবস্থা হইলে, হাইকোর্ট হইতে প্রিভিকাউন্সিলে এই সকল মামলার আর সরাসরি আপীল চলিবে না।

নূতন শাসনতন্ত্রের বিধান, তদন্তর্গত স-কাউন্সিল রাজার আদেশ, দেশীয় রাজাদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রদত্ত ক্ষমতা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন-সভার আইন—এই সকল সম্পর্কে দেশীয় রাজ্যের হাইকোর্টে যে মামলা হইবে, মাত্র তাহার আপীলই যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতে হইতে পারিবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হইতে প্রিভি কাউন্সিলেও উহার আপীল চলিবে।

কোন্ কোন্ দেশীয় রাজ্যের বিচারালয় হাইকোর্টরূপে গণ্য হইবে, তাহা সম্রাট দেশীয় নরপতিদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ঘোষণা করিবেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ও প্রিভি কাউন্সিল—যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের **বিনা অনুমতিতেই** উহার প্রাথমিক বিচার বিভাগীয় নির্দেশের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করা চলিবে। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে আপীল করিতে হইলে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত বা স-কাউন্সিল রাজার **অনুমতি প্রয়োজন**। এই অনুমতি বিনা ঐ সব বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হইতে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল চলিবে না।

বিবিধ—ব্রিটিশ প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্যের হাইকোর্ট হইতে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতে কোন আপীল হইলে, ঐ সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের রায় হাইকোর্টকে যথাযথ মান্য করিতে হইবে। ব্রিটিশ প্রদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী দেশীয় রাজ্য সমন্বিত সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ও বিচার বিভাগ সর্ববিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতকে সাহায্য করিবে।

কেবলমাত্র আইন-ঘটিত প্রশ্ন সম্বন্ধেই গভর্নর্ জেনারেল্ কর্তৃক এই

আদালতের মত চাহিবার অধিকার থাকিবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত গভর্নর-জেনারেলের মত লইয়া উহার উকিল ও মামলার ব্যয় প্রভৃতি সম্বন্ধে বিধি-ব্যবস্থা করিবে।

প্রধান বিচারপতির নির্দেশমত এই আদালতের মামলা বিষয়ে বিচারক সাব্যস্ত হইবেন, কিন্তু ৩ জনের কম সংখ্যক বিচারক দ্বারা কোন বিচার হইতে পারিবে না।

ব্রিটিশ ভারতীয় হাইকোর্ট

১৮৬১ খ্রীঃ অব্দের ভারতীয় হাইকোর্ট এ্যাক্ট অনুসারে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ নগরের প্রাচীন বিচারালয়গুলি উঠিয়া যায় এবং উহাদের স্থানে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পরে লাহোর, এলাহাবাদ, পাটনা, নাগপুর ও রেঙ্গুন হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। হাইকোর্টের তেমন কোন প্রয়োজন না থাকায়, উহার পরিবর্তে অযোধ্যাতে চীফ্ কোর্ট এবং মধ্য-প্রদেশ, বেরার, সিন্ধুদেশ ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে জুডিশিয়াল কমিশনার-কোর্ট স্থাপিত হইয়াছে; সম্রাট্ উপরি উক্ত সকল কোর্টকেই হাইকোর্ট রূপে ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি নূতন হাইকোর্ট স্থাপন করিতে বা একাধিক হাইকোর্টকে একত্রিত করিতে পারেন। সম্রাট্ প্রতি হাইকোর্টের জন্যই একজন **প্রধান বিচারক** ও কয়েকজন নিম্নতর বিচারক নিযুক্ত করিবেন। হাইকোর্টের কর্মভার বৃদ্ধি পাইলে গভর্নর-জেনারেল্ (ঊর্ধ্বপক্ষে ২ বৎসরের জন্য) অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ করিতে পারেন। তিনি অবশ্য অস্থায়ীভাবে প্রধান বিচারকও নিযুক্ত করিতে পারিবেন। কিন্তু স্থায়ী বিচারক নিয়োগ এবং প্রতি হাইকোর্টের বিচারক-সংখ্যা নির্ধারণের ক্ষমতা থাকিবে শুধু সম্রাটের। সাধারণত এই বিচারকগণ ৬০ বৎসর বয়স পর্যন্ত কার্য করিবেন। কিন্তু প্রিভি

কলিকাতা হাইকোর্ট

কাউন্সিল্ ইচ্ছা করিলে মানসিক ও শারীরিক অক্ষমতার জন্য ইহার পূর্বেও তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারিবে। বিচারকগণ অবশ্য স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

কেবল নিম্নোক্ত ব্যক্তিরাই হাইকোর্টের বিচারক হইবার যোগ্য :—

১। ইংল্যাণ্ড বা উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের ব্যারিস্টার অথবা স্কটল্যাণ্ডের এ্যাড্‌ভোকেট্ (১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন);

২। (অন্তত ৩ বৎসর) জেলা-জজরূপে কার্য করিয়াছেন, এমন ভারতীয় সিভিল্ সার্ভিসে (১০ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন) কর্মচারি;

৩। (অন্তত ৪ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন) সাব্‌জজ্ বা স্মল্ কজেস্ কোর্টের (Small Causes Court) বিচারক;

৪। (অন্তত ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন) ভারতীয় হাইকোর্টের উকিল।

কিন্তু উপরি উক্ত গুণসম্পন্ন ব্যারিস্টার, এ্যাড্‌ভোকেট্‌, উকিল অথবা হাইকোর্টের (৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন) বিচারক ব্যতীত কেহ হাইকোর্টের **প্রধান বিচারপতি** নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। ভারতীয় সিভিল্‌ সার্ভিসের কর্মচারিগণ অস্থায়ী প্রধান বিচারক হইতে পারিলেও, ঐ পদে স্থায়িভাবে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের বিচারকদের মত, হাইকোর্টের বিচারকদের বেতন, ছুটি ও পেন্‌শন প্রভৃতি স-কাউন্সিল রাজাই স্থির করিবেন। ১৯১৯ সনের আইন অনুসারে কলিকাতা হাইকোর্ট ব্যতীত সকল হাইকোর্টই প্রাদেশিক সরকারের কর্তৃত্বাধীনে যায়। ১৯৩৫ সনের আইনে কলিকাতা হাইকোর্ট সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। এখন সকল হাইকোর্টেরই বিচারকদের বেতন ও অন্যান্য যাবতীয় খরচ প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে দেওয়া হইতেছে। গভর্নর আইন-সভার মতের বিরুদ্ধেও এইজন্য প্রাদেশিক তহবিল হইতে অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন। নূতন আইনে হাইকোর্টের বিচারকদের ⅓ অংশ ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের কর্মচারি ও ⅓ অংশ গ্রেটব্রিটেনের ব্যরিস্টার শ্রেণী হইতে নিয়োগের পূর্বপ্রথা রহিত হইয়াছে।

যেখানে একাধিক প্রদেশের বিচার-ব্যবস্থা এক হাইকোর্টের অধীনে আছে, সেখানে ঐ প্রদেশগুলির কোন আইন-সভাই হাইকোর্টের এলাকা বাড়াইতে বা কমাইতে পারিবে না। বঙ্গদেশ ও আসাম এখনও কলিকাতা হাইকোর্টের অধীনে রহিয়াছে।

অধিকার—হাইকোর্টের সৃষ্টি ও গঠনের কর্তৃত্ব পার্লামেণ্ট বা স-কাউন্সিল রাজার হাতে থাকিলেও, উহার পরিচালনা-ভার হাইকোর্টের নিজের হাতেই দেওয়া হইয়াছে। প্রাদেশিক হাইকোর্ট উহার অধীনস্থ নিম্ন আদালতসমূহকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করিবে; যুক্তরাষ্ট্রীয় বা প্রাদেশিক আইনের বৈধতা সম্বন্ধীয় কোন বিষয় নিম্ন আদালতের বিচারাধীন থাকিলে,হাইকোর্ট তাহা নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারিবে।

কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ হাইকোর্টের এক **প্রাথমিক বিচার বিভাগ** (Original Jurisdiction) রহিয়াছে। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ নগরের কতিপয় মূল মোকদ্দমা স্থানীয় হাইকোর্টের প্রাথমিক বিচার বিভাগে পরিচালিত হইয়া থাকে। অবশ্য, অন্যান্য হাইকোর্ট সমূহের মত, ইহাদেরও একটি **আপীল বিচার বিভাগ** আছে। নিম্ন আদালত হইতে উপস্থাপিত আপীলের বিচারই হাইকোর্টের সর্বপ্রধান কর্তব্য। প্রদেশের আভ্যন্তরীণ মোকদ্দমা সংক্রান্ত আপীল বিচারে হাইকোর্টের রায়ই সাধারণত মীমাংসা-রূপে গণ্য হয়। হাইকোর্টে **ফৌজদারি ও দেওয়ানি** উভয়বিধ বিচারই হইতে পারে।

নিম্ন আদালত

হাইকোর্টের অধীনে প্রতি জেলায় একজন **জেলা-জজ্** রহিয়াছেন। জেলার ফৌজদারি ও দেওয়ানি বিচার তিনিই পরিচালিত করেন। **দেওয়ানি বিভাগে** অতিরিক্ত জজ্ ব্যতীত, সাব জজ্ এবং মুন্সেফও আছেন। জজ্ ও সাব্‌জজ্‌গণ জেলার সমস্ত দেওয়ানি মামলার **প্রাথমিক বিচার** করিতে পারেন। বাংলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ এবং আসামে দেওয়ানি বিচারের জন্য সর্বনিম্নে মুন্সেফ্ আছেন। ইহারা কেবল ছোট ছোট দেওয়ানি মোকদ্দমার (কোথাও ১ হাজার, কোথাও ২ হাজার টাকার অনধিক দাবী সংশ্লিষ্ট) বিচার করিতে পারেন।

কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ শহরে আবার একটি করিয়া **স্মল্ কজেস্ কোর্ট** (Small Causes Court) আছে। এখানে অতি অল্প সময়ে ছোট ছোট দেওয়ানি মামলার বিচার হইয়া থাকে। সাধারণত, এখানকার বিচারের বিরুদ্ধে আপীল চলে না।

প্রতি ইউনিয়ন বোর্ডই (Union Board) আবার নিজ নিজ এলাকাধীন ছোট ছোট মোকদ্দমার বিচার করিতে পারে। দেওয়ানি

মোকদ্দমার বিচারের জন্য ঐ বোর্ডের জন্য কয়েক সভ্য লইয়া একটি **ইউনিয়ন কোর্ট** (Union Court) গঠিত হয়।

ফৌজদারি বিভাগে প্রতি জেলায় দায়রা জজ্ (Sessions Judge) আছেন। জেলা-জজই এই দায়রা জজের কার্য করিয়া থাকেন। দায়রা জজের অধীনে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট্ এবং তাঁহার নিম্নে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্‌গণ ফৌজদারি মোকদ্দমার বিচার করেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্‌রা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদের দণ্ড দানের ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত অল্প। ইহা ছাড়া, অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট্‌ও (Honorary Magistrate) আছেন। তাঁহারা বেতন পান না। হাইকোর্টের মত জেলার দায়রা জজ্‌ও যে কোন ফৌজদারি দণ্ড দিতে পারেন; তবে মৃত্যুদণ্ড দিতে হইলে তাঁহাকে হাইকোর্টের অনুমোদন লইতে হয়

কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ শহরে ফৌজদারি বিচারের জন্য জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের স্থানে চীফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট্ এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের স্থানে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট্ আছেন।

আপীল বিচার—জেলার দেওয়ানি বিভাগীয় মুন্সেফ ও সাব্‌জজ এবং ফৌজদারি বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি মেজিস্ট্রেটের বিচারের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারে। জেলা-জজ্‌রূপে দেওয়ানি এবং দায়রা জজ্‌রূপে ফৌজদারি মামলার আপীল বিচার জেলা-জজ্‌ই করিয়া থাকেন। অবশ্য, তাঁহার বিচারের বিরুদ্ধেও প্রাদেশিক হাইকোর্টে আপীল করা যায়। চীফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটেরও জেলা-জজের অনুরূপ ক্ষমতা আছে।

নিম্ন-আদালতের বিচারক নিয়োগ—গভর্নর হাইকোর্টের সহিত আলোচনা করিয়া জেলা-জজ্, সহকারী জেলা-জজ্, ছোট আদালতের প্রধান বিচারক, চীফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট, সেসন্

জজ্ এবং সহকারি সেসন্ জজ্ নিযুক্ত করিবেন। গভর্নর এই নিয়োগ ব্যাপারে "নিজ বিবেচনামত" কার্য করিবেন। এই সকল পদে পুরাতন সরকারি কর্মচারি অথবা অন্তত পক্ষে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ব্যারিস্টার, স্কট্‌ল্যাণ্ডের এ্যাড্‌ভোকেট্ বা ভারতীয় উকিল ব্যতীত আর কেহ নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। অবশ্য, ইম্পিরিয়াল্ ও অধস্তন চাকুরিতে অভিজ্ঞ কর্মচারিরাও এই সকল পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

অধস্তন বিচারক (Subordinate Judge) ও মুন্সেফ্‌দের যোগ্যতা (qualifications) গভর্নর প্রাদেশিক সরকারি কর্মচারি নির্বাচন-কমিশন (Provincial Public Service Commission) এবং হাইকোর্টের সঙ্গে আলোচনা করিয়া নির্ধারণ করিবেন। পরে ঐ কমিশন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা লইয়া উপযুক্ত পদ-প্রার্থীদের এক তালিকা করিবেন এবং গভর্নর উহাদের মধ্য হইতে সাব্‌জজ্ ও মুন্সেফ্ নিযুক্ত করিবেন। গভর্নর অবশ্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপযুক্ত পদ-প্রার্থীদের মধ্য হইতে যথাসম্ভব এই সকল পদে লোক নিয়োগ করিবেন। কিন্তু ইহাদের বিচারকার্যে নিয়োগ, পদোন্নতি, ছুটি ইত্যাদি হাইকোর্টের হাতে থাকিবে।

উপরস্থ কর্মচারির আদেশ বা আচরণে অসন্তুষ্টির কারণ ঘটিলে, সকল বিচারকদেরই উহার বিরুদ্ধে গভর্নরের নিকট আপীলের অধিকার থাকিবে।

ফৌজদারি বিভাগীয় ডেপুটি ম্যাজিস্টেট্, সাব্‌ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্ প্রভৃতিও উপরিউক্ত ভাবেঃ সার্ভিস্ কমিশন্ কর্তৃক নির্বাচিত এবং গভর্নর কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। কিন্তু ইহাদের অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পরামর্শ বিনা কোন সুপারিশ চলিবে না।

সরকারি কর্মচারিদের হাতে এই ভাবে বিচারক নিয়োগের ও বিচার সম্পর্কে কর্তৃত্বের ভার থাকিলে বিচারে নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হইবার

আশঙ্কা থাকে। তাই স্যর্ তেজ বাহাদুর সপ্রু প্রমুখ অনেকেই হাইকোর্টের হাতে এই নিয়োগ ক্ষমতা অর্পণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। *

গ্রাম-অঞ্চলে ইউনিয়ন বোর্ডের **ইউনিয়ন বেঞ্চও** (Union Bench) ছোট ছোট ফৌজদারি মোকদ্দমার বিচার করিয়া থাকে।

জুরীর বিচার :—আইনের জটিলতায় অনভিজ্ঞ অথচ বিচক্ষণ ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিদের সাহায্যে বিচার পরিচালনার প্রথা অনেক দেশেই প্রচলিত আছে। এইরূপ বিচারই জুরীর বিচার নামে পরিচিত। জন-সাধারণের মধ্য হইতেই জুরী লওয়া হয়। জুরিগণ তাঁহাদের **সাধারণ বিবেচনামতই** আসামীর দোষ-গুণ বিচার করেন; এবং বিচারক আইন অনুসারে দোষীর শাস্তি বিধান করেন। আসামীর পক্ষে ও বিপক্ষে যে সকল সাক্ষ্য-প্রমানাদি থাকে, তাহার সত্যতা নিরূপণই জুরীর কর্ত্তব্য। সাধারণত স্থানীয় ভদ্রলোকদের মধ্য হইতেই জুরী নির্বাচিত হয়; কিন্তু কোন আইন-ব্যবসায়ী জুরী হইতে পারেন না।

ভারতে কেবল **গুরুতর ফৌজদারি** অপরাধ বিচারের জন্যই জুরীর সাহায্য লওয়া হয়। কোন গুরুতর ফৌজদারি অপরাধের জন্য আসামীর দ্বীপান্তর বা মৃত্যুদণ্ড হইবার আশঙ্কা থাকিলেই দায়রা জজ্ জুরীর সাহায্যে বিচার করেন। কোথাও কোথাও আবার এ্যাসেসরদের সাহায্যেও এইরূপ বিচার হইয়া থাকে।

হাইকোর্টের জুরিগণ একমত হইলে, বিচারক তাঁহাদের মত গ্রহণ করিতে বাধ্য। কিন্তু সকলে একমত না হইলে, বিচারক অন্য বিচারকের নিকট উহা প্রেরণ করিতে পারেন। কিন্তু জেলার দায়রা জজ্ জুরীরা একমত হইলেও, তাঁহাদের মত অগ্রাহ্য করিতে পারেন; অবশ্য তাঁহাকে ঐ মামলা তখন হাইকোর্টে প্রেরণ করিতে হয়।

---

* ইহা উল্লেখযোগ্য যে গভর্নর্-জেনারেল্, গভর্নর, চীফ্-কমিশনার এবং হাইকোর্টের বিচারকগণ তাঁহাদের কার্যের জন্য সাধারণত কোন আদালতের বিচারাধীন নহেন।

বিচার-বিভাগ

প্রিভি কাউন্সিলের জুডিশিয়াল্ কমিটি

দেওয়ানি

হাইকোর্ট (প্রাথমিক ও আপীল বিচার বিভাগ)

জেলা-জজ্

সাব্ জজ্

স্মল্‌কজেস্ কোর্ট

মুন্সেফ্

ইউনিয়ন কোর্ট

ফৌজদারি

হাইকোর্ট (প্রাথমিক ও আপীল বিচার-বিভাগ)

দায়রা জজ্

ম্যাজিস্ট্রেট্

ইউনিয়ন্ বেঞ্চ

চীফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট্

প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট্
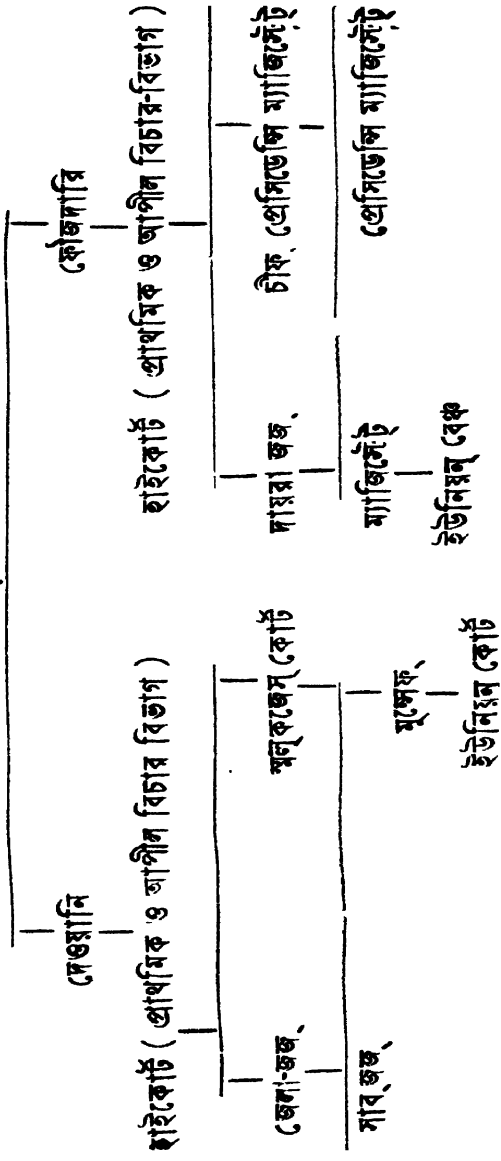
অষ্টম অধ্যায়

সরকারি চাকুরি

"এ দেশের সিভিল্ সার্ভিসের সাহেবদিগকে আমি মনুষ্য-জাতি মধ্যে আম্রফল মনে করি। এদেশে আম্র ছিল না, সাগর-পার হইতে কোন মহাত্মা এই উপাদেয় ফল এদেশে আনিয়াছেন। আম্র দেখিতে রাঙা, ঝাঁকা আলো করিয়া বসে। কাঁচায় বড় টক—পাকিলে সুমিষ্ট বটে, কিন্তু তবুও হাড়ে টক যায় না।"

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (কমলাকান্তের দপ্তর, "মনুষ্য-ফল")।

গণতান্ত্রিক শাসনে আইন-সভা আইন-প্রণয়ন ভিন্ন শাসনের মূল নীতিও নির্ণয় করিয়া থাকে। মন্ত্রিমণ্ডলী ঐ নীতিসমূহ কার্যে পরিণত করে। নির্বাচক জন-সাধারণের মত-পরিবর্তন অনুসারে, আইন-সভার সংখ্যাগরিষ্ঠদল ও মন্ত্রিমণ্ডলী পরিবর্তিত হইলেও, শাসন যথারীতি চলিতে থাকে। কেন না, কর্ম-নির্বাহক মন্ত্রিমণ্ডলীর (ভারতে গভর্নর্ জেনারেল্, গভর্নর ও তাঁহাদের মন্ত্রিসভা) শাসন-নীতি অনুসারে তাঁহাদের অধীনস্থ স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ শাসন-বিভাগীয় কার্যাদি পরিচালনা করে। কাজেই এই সাধারণ কর্মচারিদের যোগ্যতা অনুযায়ী নির্বাচন এবং চাকুরির স্থায়িত্ববিধান সুশাসনের জন্য প্রয়োজন।

ভারতের যাবতীয় সরকারি কর্মচারি প্রথমত **সামরিক** ও অ-সামরিক—এই দুই বিভাগে বিভক্ত। **সামরিক** বিভাগে ভারতের প্রধান সেনাপতিই সর্বপ্রধান কর্মচারি। প্রধান সেনাপতি এবং অন্যান্য প্রধান সামরিক কর্মচারির নিয়োগ স-কাউন্সিল রাজার নির্দেশ অনুসারেই হইবে। এই সকল সামরিক চাকুরির নিয়মাদি ভারত-সচিব

তাঁহার উপদেষ্টাদের মতানুযায়ী নির্ধারণ করিবেন। সামরিক কর্মচারিগণ পূর্ব হইতেই ভারত-সচিবের নিকট আপীলের অধিকার ভোগ করিতেছেন; নূতন আইনেও ইহা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ভারতীয় সামরিক বিভাগ এইরূপে ভারত-সচিবের শেষ কর্তৃত্বাধীনে রহিয়াছে। সৈনিকদের বেতনাদি যুক্তরাষ্ট্রীয় তহবিল হইতে দেওয়া হইবে। ভারতীয় সামরিক ও অ-সামরিক সরকারি কর্মচারিবর্গের পুত্রদের ভারতীয় সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ সম্বন্ধে পূর্ব ব্যবস্থা বহাল আছে। কিন্তু এই আইনে সামরিক বিভাগীয় চাকুরি সমূহে ভারতীয়দিগের অধিকতর প্রবেশাধিকার দেওয়ায় কোন সুস্পষ্ট ব্যবস্থা হয় নাই। অবশ্য, এই বিষয়ে রাজপদেশ লিপিতে গভর্নর্ জেনারেল্‌কে দৃষ্টি রাখিতে বলা হইয়াছে।

অ-সামরিক বিভাগ—সিভিল্ (বা অ-সামরিক) সার্ভিসের কর্মচারিরাই সরকারের দৈনন্দিন সাধারণ শাসন-কার্য পরিচালনা করেন। ভারতের এই সার্ভিসের এক ইতিহাস আছে। ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের প্রথমেই ১৭৯৩ সনে এই সিভিল্ সার্ভিস্ প্রথা প্রবর্তিত হয়। কোম্পানির ডিরেক্টরদের মনোনয়ন দ্বারাই ১৮৫৩ সন পর্যন্ত এই চাকুরিতে লোক **নিয়োগ** করা হইত। পরে কর্মচারি নির্বাচনের উদ্দেশ্যে **প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা**র ব্যবস্থা হয়। কিন্তু বিলাতী পরীক্ষায় কৃতকার্য হইয়া ভারতীয়দের এই চাকুরি লাভ করা তখন সহজ ছিল না। তাই ১৮৭৯ সালে স্ট্যাটুটারি সিভিল্ সার্ভিস্ প্রথা প্রবর্তিত হইল। এই প্রথা অনুসারে, প্রাদেশিক সরকার স-কাউন্সিল ভারত-সচিবের সম্মতি লইয়া কয়েকজন উপযুক্ত ভারতীয়কে এই চাকুরিতে **নিয়োগ** করিতেন। কিন্তু, এই রীতিও কার্যকরী না হওয়ায়, ১৮৮৮ সালের পাব্‌লিক্ সার্ভিস কমিশনের নির্দেশ মত সমস্ত সরকারি চাকুরি **নিখিল-ভারতীয়** সিভিল্ সার্ভিস্, **প্রাদেশিক** সিভিল্ সার্ভিস্ ও

অধস্তন সিভিল্ সার্ভিসে বিভক্ত হয়। ইহার মধ্যে প্রাদেশিক ও অধস্তন সিভিল্ সাভিস্ প্রাদেশিক সরকারের কর্তৃত্বাধীনে ন্যস্ত হইল। নিখিল-ভারতীয় সিভিল্ সাভিস্ রহিল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে। সাধারণত, সরকারের কতিপয় বিভাগের সেক্রেটারি, জেলাজজ্, ম্যাজিস্ট্রেট্, রেভিনিউ বোর্ডের সভ্য, রাজস্ব ও শুল্ক-কমিশনার প্রভৃতি উচ্চপদে ভারতীয় সিভিল্ সার্ভিসের (I. C. S.) সভ্যদের মধ্য হইতেই লোক নিয়োগ করা হয়। ভারতীয় সিভিল্ সার্ভিসের মত ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, শিক্ষা, পোস্ট্, টেলিগ্রাফ্ ও বন ইত্যাদি বিভাগেও নিখিল-ভারতীয় পদের সৃষ্টি হইয়াছিল। ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি বিভাগের বড় চাকুরিগুলিকে কেন্দ্রীয় সার্ভিসের অন্তর্গত বলা হয়।

ভারতীয় সিভিল্ সার্ভিসে ভারতবাসী নিয়োগের সুবিধার জন্য এদেশেও **প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা** গ্রহণ সম্পর্কে ভারতের নেতাগণ বহুকাল আন্দোলন করিতেছিলেন। ১৮৯৩ সালে পার্লামেণ্ট এই নীতি সমর্থন করিয়া এক প্রস্তাব পাশ করেন। কিন্তু এই প্রথা মাত্র মণ্টেগু চেম্স্ফোর্ড শাসন-সংস্কারের পরে প্রবর্তিত হইয়াছে। ১৯৩৬ সাল হইতে এক ব্যবস্থা হইয়াছে যে, ভারতীয় সিভিল্ সার্ভিসে ভারত-সচিব ইউরোপীয়দিগকে পরীক্ষা ব্যতীত **মনোনয়ন** দ্বারাও নিয়োগ করিতে পারিবেন। বর্তমানে ভারতীয় সিভিল্ সার্ভিসে ৳ অংশ কর্মচারি ভারতীয়দের মধ্য হইতে লওয়া হয়। ১৯৩৯ সনের মধ্যে এই চাকুরিতে ভারতবাসীর সংখ্যা অর্ধেক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নূতন আইনে এই চাকুরিতে ভারতীয়দের হার নির্ধারণের ভার ভারত-সচিবের হাতে দেওয়া হইয়াছে। এই হার অবশ্য প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্তনের ৫ বৎসর পরে আলোচনার পর বদলান যাইতে পারে; ততদিন পর্যন্ত বর্তমান হারই বজায় থাকিবে।

সাধারণ ব্যবস্থা—যুক্তরাষ্ট্র-সংশ্লিষ্ট কর্মচারিদের নিয়োগ ও

চাকুরির নিয়মাদি সম্বন্ধে গভর্নর্-জেনারেল্ বা তৎনিযুক্ত লোকই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিবেন। প্রদেশ-সংশ্লিষ্ট কর্মচারিদের নিয়োগ ও চাকুরির বিধানাদির ভার থাকিবে গভর্নর্ বা তৎনিযুক্ত লোকের হাতে। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের প্রধান বিচারপতি উহার কর্মচারি নিয়োগ করিবেন, আর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করিবেন হাই-কোর্টের কর্মচারি। অবশ্য, গভর্নর্-জেনারেল্ ও গভর্নর্ এই সম্পর্কে উক্ত বিচারপতিদিগকে যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং প্রাদেশিক কর্মচারি-নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে পরামর্শের নির্দেশ দিতে পারিবেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় রেলওয়ে কর্মচারি নিয়োগ করিবেন যুক্তরাষ্ট্রীয় রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। আইন-সভা অ-সামরিক চাকুরি সম্পর্কে বিধান করিতে পারিবেন সত্য, কিন্তু তথাপি গভর্নর-জেনারেল্ এবং গভর্নরের কর্মচারিবিশেষ সম্বন্ধে ন্যায্য ব্যবস্থা করার অধিকার থাকিবে। রেলওয়ে, শুল্ক-বিভাগ এবং পোস্ট্ ও টেলিগ্রাফ্ বিভাগীয় চাকুরিতে ইঙ্গ-ভারতীয়দের (Anglo-Indians) সম্পর্কে বিশেষ বিবেচনার কথাও আছে। নিম্নতর পুলিস বিভাগের চাকুরি পুলিস কর্তৃপক্ষই নিয়ন্ত্রণ করিবেন। কর্মচারিদের পদচ্যুত করিবার অধিকার একমাত্র নিয়োগ কর্তারই থাকিবে।

ভারত-সচিব-নিযুক্ত কর্মচারি—পার্লামেণ্ট অন্যরূপ ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত, ভারত-সচিবই ভারতীয় সিভিল্ সার্ভিস্ (I. C. S.); ভারতীয় মেডিক্যাল্ সার্ভিস্ (I. M. S.) ও ভারতীয় পুলিস সার্ভিসে (I. P. S.) কর্মচারি নিয়োগ করিবেন। গভর্নর্-জেনারেলের নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য যে কর্মচারি প্রয়োজন, গভর্নর্-জেনারেলের ইচ্ছাধীন সময় পর্যন্ত তাঁহাদের নিয়োগও ভারত-সচিবের হাতে থাকিবে। ভারত-সচিব সেচ্ বিভাগে উচ্চপদস্থ কর্মচারিও নিযুক্ত করিতে পারিবেন। অবশ্য, এই সকল নিয়োগ-ব্যবস্থা পার্লামেণ্ট পরিবর্তন করিতে পারিবে। ভারত-সচিব কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারিদের সংখ্যা, বেতন ও ছুটি প্রভৃতিও

ভারত-সচিবই নিয়ন্ত্রণ করিবেন। গভর্নর্ জেনারেলের কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্মচারি, তাঁহাদের পদোন্নতি ও শাস্তির ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকিবে। গভর্নরও তেমনি, ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রাদেশিক কর্মচারি, তাঁহাদের পদোন্নতি ও শাস্তির ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। এই কর্মচারিদের বেতনও যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং প্রাদেশিক তহবিল হইতেই দেওয়া হইবে।* ভারত-সচিব কর্তৃক নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক কর্মচারিদের যথাক্রমে ভারত-সচিব ও গভর্নর্ জেনারেলের নিকট উপরস্থ কর্মচারির আচরণ সম্পর্কে আপীলের অধিকার থাকিবে।

সংরক্ষিত বিষয়ের চাকুরিতে (reserved posts) যুক্তরাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়ে গভর্নর্-জেনারেল্ ও প্রদেশ-সংক্রান্ত বিষয়ে গভর্নর্ কর্মচারি নিয়োগ করিবেন। এই সংরক্ষিত বিষয়ের কর্মচারিরাও ভারত-সচিব কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারির অনুরূপ সুবিধাদি ভোগ করিবে। উপরি-উক্ত সকল চাকুরিরই নিয়মাবলী পার্লামেণ্ট কর্তৃক মঞ্জুর হওয়া চাই।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, চাকুরি সম্পর্কে ভারত-সচিবকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহা তাঁহার উপদেষ্টাদের সম্মতিমতই তাঁহাকে পরিচালনা করিতে হইবে। দেশীয় রাজ্যের রাজা ও প্রজা বা ভারত সংলগ্ন রাজ্যের প্রজা, গভর্নর্-জেনারেল্ বা ভারত-সচিব কর্তৃক মনোনীত হইলে, ভারতে সরকারি কর্মচারি নিযুক্ত হইতে পারিবেন। ইহা ছাড়া, কোন অ-ব্রিটিশ প্রজা সাধারণত এই চাকুরি পাইবে না। †

* কিন্তু ইঁহাদের সকলের পেন্‌শন্‌ই যুক্তরাষ্ট্রীয় তহবিল হইতে দেওয়া হইবে এবং অবশ্য দেয় বলিয়া ইহা আইন-সভার ভোটে দেওয়া হইবে না।

† বেতন ও ক্ষমতা প্রভৃতি সর্ব বিষয়েই ভারতীয় ঊর্ধ্বতন সরকারি চাকুরির (বিশেষত, আই, সি, এস্) যথেষ্ট সুবিধা রহিয়াছে। বর্তমান

সরকারি কর্মচারি নির্বাচন কমিশন (Public Service Cmmission)—কর্মচারি নির্বাচন কমিশন্ ১৯১৯ সালের ভারত-শাসন আইন অনুসারে এদেশে কেন্দ্রীয় চাকুরিতে লোক নিয়োগের জন্য প্রথম গঠিত হয়। বর্তমান আইন অনুসারে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এক কর্মচারি নির্বাচন কমিশন্ থাকিবে এবং প্রতি প্রদেশেই আবার একটি করিয়া অনুরূপ কমিশন্ থাকিবে। কিন্তু প্রয়োজন হইলে, একাধিক প্রদেশের জন্য একই কর্মচারি নির্বাচন কমিশন্ থাকিতে পারিবে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্মচারি নির্বাচন কমিশন প্রদেশের কার্য করিতে পারিবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কমিশনের সভাপতি ও সভ্যবৃন্দ গভর্নর্-জেনারেল্ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন ; প্রাদেশিক কমিশনের সভাপতি ও সভ্য নিয়োগ করিবেন গভর্নর্। প্রতি কর্মচারি নির্বাচন কমিশনেরই অন্তত অর্ধেক সভ্যের সরকারি কার্যে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকা চাই। *

আইনে ভারতবাসীর হাতে শাসন ক্ষমতা অনেকেটা ন্যস্ত হওয়ায়, এই সব চাকুরির সুবিধাগুলি রক্ষিত না হইলেও পারে মনে করিয়া চাকুরিসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যবস্থা হইয়াছে। ফলে উচ্চতর সরকারি চাকুরির উপর দেশীয় মন্ত্রীদের ক্ষমতা একেবারেই খর্ব করা হইয়াছে। ব্যয়-হ্রাসের সম্ভাবনাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আই, সি, এস্ ; আই, এম্, এস্ ; ও আই, পি, এস্ প্রভৃতি চাকুরির নিয়োগ ভারত সচিবের হাতে রাখিতে ভারতীয় প্রতিনিধিগণ গোলটেবিল বৈঠকে যথেষ্ট আপত্তি করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশ সমূহের (Dominions) কর্মচারি নিয়োগের ক্ষমতা কিন্তু ঔপনিবেশিক সরকারের হাতেই আছে।

* ১ জন সভাপতি ও অপর ৩ জন সাধারণ সভ্য লইয়া কেন্দ্রীয় সরকারি নির্বাচন কমিশন গঠিত হইয়াছে। প্রদেশগুলিতে সভাপতি ও দুইজন সভ্য লইয়া এইরূপ কমিশন গঠিত হইয়াছে। বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশ, তিন প্রদেশ একটি কমিশন দিয়াই কাজ চালাইতেছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারি কর্মচারি নির্বাচনের জন্য কর্ম-প্রার্থীদের **পরীক্ষা গ্রহণ** করাই হইবে এই কমিশনগুলির প্রধান কার্য। সাধারণত এই কমিশনসমূহের মত লইয়াই অ-সামরিক কর্মচারি নির্বাচন এবং উহাদের পদোন্নতি, বদলি, শাস্তি, ক্ষতিপূরণ ও পেন্‌শন্‌ প্রভৃতির ব্যবস্থা হইবে। কিন্তু ভারত-সচিব তাঁহার কর্তৃত্বাধীন নিয়োগে এবং গভর্নর্‌-জেনারেল্‌ ও গভর্নর্‌ স্বীয় বিবেচনাধীন বিষয়ে কর্মচারি নিয়োগে এই চাকুরি কমিশন সমূহের অভিমত নাও চাহিতে পারেন। চাকুরিতে সাম্প্রদায়িক হার নির্ধারণ এবং নিম্নতম পুলিস কর্মচারি নিয়োগে ইহাদের মতামত প্রয়োজন হইবে না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক আইন-সভা কর্মচারি নির্বাচন কমিশনের হাতে উপরিউক্ত ক্ষমতার অতিরিক্ত ক্ষমতা দিতে পারিবে। কিন্তু ভারত-সচিব-কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারি বা সামরিক কর্মচারি সম্বন্ধে তাঁহার সম্মতি বিনা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় অন্যান্য চাকুরি সম্পর্কে গভর্নর্‌-জেনারেলের মত ব্যতীত চাকুরি কমিশন্‌ ঐ অতিরিক্ত ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারিবে না। যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্মচারি নির্বাচন কমিশনের যাবতীয় খরচ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক কমিশনের খরচ প্রাদেশিক সরকার বহন করিবে।

অন্যান্য ব্যবস্থা—ভারতীয় ফৌজদারি ও দেওয়ানি কার্যবিধি আইনে সরকারি কর্মচারিদের আদালত হইতে অব্যাহতির নানা ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই সকল অধিকার ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যে কোন আইন যুক্তরাষ্ট্রে বা প্রদেশে যথাক্রমে গভর্নর্‌-জেনারেল্‌ ও গভর্নরের সম্মতি ব্যতীত উত্থাপিত হইতে পারিবে না। দেওয়ানি কার্যবিধি অনুসারে আনীত মামলায় কোন সরকারি কর্মচারির অর্থদণ্ড হইলে, উহা তাহার কর্মস্থান অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় বা প্রাদেশিক তহবিল হইতে দেওয়া হইবে।

বিভিন্ন কর্মচারিদের নানা গচ্ছিত তহবিলের * অর্থ যাহাতে ভবিষ্যতে অপব্যয়িত না হইতে পারে, সেইজন্য স-কাউন্সিল রাজা উপযুক্ত কমিশনার নিযুক্ত করিয়া, ঐ কমিশনারদের নিকট উক্ত অর্থ গচ্ছিত রাখিবেন। কমিশনারগণই উপরি উক্ত তহবিলসমূহ সুদে খাটাইবেন ও উহা হইতে পেন্‌শনাদি দিবেন।

ভারত-সচিব, গভর্নর্ জেনারেল্ ও গভর্নর্ আপত্তি না করিলে, মহিলারাও পুরুষের মত নানা সিভিল্ সার্ভিসে নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

* Indian Military Widow and Orphans' Fund, Superior Service Family Pension Fund, Indian Military Service Family Pension Fund, Indian Civil Service Family Pension Fund.

নবম অধ্যায়

জেলার শাসন

"যে মহৎ দায়িত্ব গ্রহণে আপনাদের আহ্বান করিতেছি তাহা কোন প্রধান সেনাপতি অথবা নৌবাহিনীর অধ্যক্ষের হাতে ন্যস্ত দায়িত্ব অপেক্ষা লঘুতর নহে।···শাসিত জনগণের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসাই হইবে আপনাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।" *

—লর্ড মর্লি (ভারত শাসনের জন্য শিক্ষানবিশ রাজ-কর্মচারিদের প্রতি বক্তৃতা)।

শাসন-কার্যের সুবিধার জন্য ব্রিটিশ ভারতকে কতগুলি **প্রদেশে** ভাগ করা হইয়াছে; প্রতি প্রদেশ আবার বিভিন্ন **বিভাগে** এবং প্রতি বিভাগ বিভিন্ন **জেলায়** বিভক্ত হইয়াছে। প্রতি জেলা আবার কতকগুলি **মহকুমায়,** প্রত্যেক মহকুমা কতকগুলি **থানায়** এবং থানাগুলি বিভিন্ন **গ্রামে** বিভক্ত।

বিভাগীয় কমিশনার—বিভাগের শাসন-কর্তার নাম **কমিশনার**। মাদ্রাজ ব্যতীত সমস্ত ব্রিটিশ প্রদেশেই বিভাগ ও বিভাগীয় কমিশনার রহিয়াছেন। বিভাগের অন্তর্গত জেলাসমূহের শাসন-কর্তাদের পরিচালন তাঁহার প্রধান কার্য। অবশ্য, রাজস্ব সম্পর্কে তাঁহার বিশেষ কর্তৃত্ব রহিয়াছে। বোম্বাই ব্যতীত সকল প্রদেশেই রাজস্ব ব্যাপারে কমিশনার ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে রাজস্ব বোর্ড

* "This is the mission with which we have to charge you and it is as momentous a mission as was ever confided to any great Military Commanders or Admirals of the Fleet······This mission of yours is to place yourself in touch with the people, you have to govern"—John Morley.

(Revenue Board) বা আর্থিক কমিশনার (Financial Commissioner) আছে।

জেলা—প্রকৃতপক্ষে জেলাসমূহই ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রধান ভিত্তি। জেলাগুলি শাসন ও গঠনের এক পূর্ব ইতিহাসও আছে। মোগল সম্রাট্ আকবর বঙ্গদেশকে বর্তমান জেলার অনুরূপ ১৯টি সরকারে বিভক্ত করিয়াছিলেন।* বাংলায় ব্রিটিশ আমলের প্রথমেই জেলা-শাসনের সুব্যবস্থা হয়; পরে বাংলার মত ভারতের অন্যত্রও এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ব্রিটিশ ভারতে মোট ২৩১টি জেলা আছে, তন্মধ্যে বাংলায় ২৮টি ও আসামে ১২টি, যুক্তপ্রদেশে ৪৮টি; গড়ে, প্রতি জেলার আয়তন প্রায় ৪,৫০০ বর্গ মাইল ও লোক-সংখ্যা প্রায় ৯ লক্ষ। ময়মনসিংহ জেলায় প্রায় ৫১ লক্ষ লোক আছে এবং ইহার পরিধি ৬ হাজার বর্গ মাইলের বেশি। সমগ্র ভারতে মাদ্রাজের ভিজাগাপটম্ জেলা আকারে বৃহত্তম (১৭,১৬৮ বর্গমাইল); কিন্তু লোক-সংখ্যা ময়মনসিংহ জেলায় সর্বাপেক্ষা বেশি। ভারতের কোন কোন জেলা লোক-সংখ্যা ও পরিধি উভয় দিক দিয়াই ইউরোপের কতিপয় স্বাধীন দেশ হইতেও বৃহত্তর।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট্—জেলার প্রধান শাসন-কর্তাকে বলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট্। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য কোন কোন জেলায় এক বা একাধিক অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট্ও থাকেন। জেলার রাজস্ব সংগ্রহের ভারও তাঁহার হাতেই। তাঁহাকে কোন কোন প্রদেশে কালেক্টর এবং কোথাও (যেমন আসামে) ডেপুটি কমিশনার বলা হয়। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট্কে তাঁহার নিজ শাসনাধীন বিষয়ে প্রায় একচ্ছত্র অধিকার দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার হাতে নানা কার্যভার ন্যস্ত।

* মাদ্রাজে চোলরাজগণও সমস্ত রাজ্যকে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর ভাগে ভাগ করিয়াছিলেন (দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

জেলার কালেক্টার-রূপে তিনি রাজস্ব আদায় করেন এবং রাজস্ব-সংক্রান্ত মোকদ্দমার বিচারও করেন ; জমাজমির বন্দোবস্তও তিনিই করেন। ম্যাজিস্ট্রেট্ হিসাবে তিনি শাসন ও ফৌজদারি মোকদ্দমার বিচার করিয়া থাকেন। জেলার শান্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষার ভারও তাঁহার হাতেই। তিনি জেলা-পুলিসের কর্তা।

জেলার পুলিস্-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে মুখ্যত জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ মত কার্য করিতে হয়। প্রাদেশিক পুলিসের-প্রধান কর্তা ইন্স্পেক্টর-জেনারেলের নিকটও পুলিস্-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে তাঁহার কাজের জন্য জবাবদিহি করিতে হয়। জেলার পুলিসবাহিনীর প্রধান কর্তা হিসাবে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পুলিস বিভাগের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাদি পরিচালনা করিয়া থাকেন। কিন্তু শান্তি ও শৃঙ্খলা ব্যাপারে তিনি জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের সহকারি। কার্যত তাই ইঁহারা দুইজনে একযোগে কাজ করিয়া থাকেন।

ফৌজদারি বিচারে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট্ ২ বৎসর পর্যন্ত জেল দিতে এবং ১ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারেন। * কিন্তু দ্বীপান্তর বা মৃত্যুদণ্ড দিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই ; উহাতে জেলা-জজেরই অধিকার। সাধারণ শাসন-ব্যাপারে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট্ প্রাদেশিক সরকারের অধীন হইলেও, এই ফৌজদারি বিচারে তিনি জেলা জজ্ ও হাইকোর্টের অধীনে।

দুর্ভিক্ষ, বন্যা প্রভৃতির প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্পর্কিত সরকারি কর্তব্য জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের উপরেই ন্যস্ত। জেলার রাজস্ব-সংগ্রাহক (Collector) হিসাবে জেলার সাধারণ অবস্থার সহিত তাঁহার পরিচয়

---

* কর্ম-নির্বাহক বিভাগে কোন কর্মচারির হাতে এই ভাবে বিচার ক্ষমতা রাখার রীতি অন্য কোথাও নাই। এই রীতি অসঙ্গত বোধে, ম্যাজিস্ট্রেটের হাত হইতে বিচার-ক্ষমতা অপসারণের প্রস্তাব অনেকেই বহুকাল করিয়া আসিতেছেন। কার্যত প্রেসিডেন্সি শহরগুলিতে ভিন্ন বিচারালয় স্থাপিত হইয়াছে।

অতি নিবিড়। স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন, কৃষি, সেচ, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাঁহার দায়িত্ব রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত, নানাবিধ সরকারি কার্যে তাঁহাকে জেলার অভ্যন্তরে সর্বদাই যাতায়াত করিতে হয়। এক কথায়, প্রাদেশিক সরকারের প্রায় সকল বিভাগের সঙ্গেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। কতিপয় ডেপুটি ও সাব্-ডেপুটি মাজিস্ট্রেটের সাহায্যে তিনি এই সকল কাজ করিয়া থাকেন।

প্রতি জেলায়ই অবশ্য এক্সিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার, সিভিল্ সার্জন্, স্কুল ইন্সপেক্টর, ফরেস্ট্ অফিসার ইত্যাদি অন্যান্য রাজকর্মচারিও আছেন। ইহা ব্যতীত জেলায় জেলায় কৃষি, আব্গারি, পশুচিকিৎসা ইত্যাদি অন্যান্য বিভাগীয় কর্মচারিও রহিয়াছেন। ইঁহারা নিজ নিজ বিভাগের প্রধান কর্তা; কিন্তু জেলা ম্যাজিস্টেট ইঁহাদের কার্য পরিদর্শন করিতে পারেন এবং ইঁহাদের নিজ নিজ বিভাগের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জানাইতে হয়। কেন না, সাধারণ শাসন পরিচালনার জন্য জেলার সমস্ত বিভাগের কার্য সম্বন্ধে তাঁহার অবগতির প্রয়োজন। তিনি কালেক্টারির কেরানি, গ্রাম্য চৌকিদার ও অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট্ নিয়োগ করেন। তিনি যোগ্য লোককে সরকারি উপাধি দেওয়া সম্বন্ধেও সুপারিশ করিয়া থাকেন।

স্থানীয় ব্যাপারের সহিত পরিচিত ও তথাকার সমস্যা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ লোক হিসাবে, জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট্ই প্রাদেশিক সরকারকে সর্ব বিষয়ে নির্ভরযোগ্য সংবাদ ও পরামর্শ দিয়া থাকেন। সরকার প্রায় সকল কার্যেই তাঁহার উপর নির্ভর করেন। প্রাদেশিক সরকার শাসনের মূলনীতি-নির্ধারণ করিলেও, তাহার অনেক বিধানই কার্যে পরিণত করার ভার থাকে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট্ ও তাঁহার অধীনস্থ বিভাগীয় কর্মচারিদের উপর। জনসাধারণের নিকট জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট্ই সরকারের প্রতীক; জনসাধারণকেই তাই বহু ব্যাপারেই তাঁহার

মুখাপেক্ষী হইতে হয়। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট্‌গণ সাধারণত ভারতীয় সিভিল্ সার্ভিস্ হইতে নিযুক্ত হন ; কেহ কেহ অবশ্য প্রাদেশিক সিভিল্ সার্ভিস্ হইতেও সংগৃহীত হইয়া থাকেন।

প্রত্যেক জেলাই তিন বা ততোধিক মহকুমায় বিভক্ত। **মহকুমার** কর্তা সাব্‌ডিভিসনাল্ অফিসার্। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের মত তাঁহারও বহুবিধ কর্তব্য। কিন্তু তাঁহার রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা নাই। তিনি একাধারে ফৌজদারি **বিচারক** ও মহকুমার **শাসন-কর্তা**। তাঁহার নির্দেশমতই মহকুমার সহকারি পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মহকুমার শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া থাকেন। মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট্‌গণ প্রধানত ভারতীয় সিভিল্ সার্ভিস্ হইতে মনোনীত হন।

থানার শাসন-কর্তা পুলিস ইন্সপেক্টর্ বা দারোগা ; নিজ এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাই তাঁহার প্রধান কার্য। তাঁহার কোন বিচার ক্ষমতা নাই। গ্রামের শান্তি রক্ষার ভার চৌকিদারের উপর ন্যস্ত। উপরিউক্ত সকল কর্মচারিই জেলার সাধারণ শাসন-কার্যে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনস্থ কর্মচারি হিসাবে তাঁহাকে সাহায্য করিয়া থাকেন।

ব্রিটিশ ভারতের শাসন-অঞ্চল ও তাহার পরিচালক :—

শাসন-অঞ্চল	শাসন-কর্তা
ব্রিটিশ ভারত	গভর্নর্-জেনারেল্
প্রদেশ	গভর্নর্
বিভাগ	কমিশনার
জেলা	ম্যাজিস্ট্রেট্
মহকুমা	সাব্‌ডিভিসনাল্ অফিসার
থানা	দারোগা

দশম অধ্যায়

স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন

"আগে আমাদের জীবন আরো অনেক বেশি সবল ছিল। যে পঞ্চায়েতের কথা আমি বলিয়াছি, তাহা পুরাকালে গ্রাম্য সমাজের মধ্যে যেন আপনা-আপনিই ফুটিয়া উঠিত। পল্লী-সমাজের যে পঞ্চায়েত, তাহা এমন পাঁচ জনেই হইতেন, যাঁহাদের উপর পল্লী-সমাজের দৃষ্টি সহজ ভাবেই আপনা-আপনিই পড়িত। ...সেই পাঁচজন, পঞ্চায়েতের অধিকার স্বভাবগুণে, সহজ ভাবে আকর্ষণ করিতেন ও পল্লী-সমাজবাসীরা সেই একই স্বভাবগুণে, সেই একই প্রকার সহজ সরলভাবে সেই অধিকার মানিয়া লইত। আমি যে সব কার্যের কথা বলিয়াছি, বিনা নির্বাচনে নির্বাচিত সেই পঞ্চায়েত সেই সব কার্যই করিত। আমি বিশ্বাস করি ও সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, আমাদের দেশের আপামর সাধারণের আপনার আবশ্যকীয় কার্য আপনি করিয়া লইবার যে কৃতিত্ব বা ক্ষমতার আবশ্যক, তাহা যথেষ্ট পরিমাণে আছে। এই স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের মধ্যে যাহাদের অশিক্ষিত বলিয়া এতাবৎ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া আসিয়াছি, তাহাদের জীবনের মধ্যে একটা বড় সভ্যতা ও সাধনা আছে।"

—চিত্তরঞ্জন দাশ ("বাংলার কথা" বঙ্গীয় প্রাদেশিক
সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ, ১৯১৭)

স্থানীয় জনসাধারণের নিজ নিজ অঞ্চলের শাসন ও সুখ-সুবিধা বিধানের যে ক্ষমতা থাকে, তাহাকে **স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন** (local self-government) বলা হয়। ভারতীয় জেলা-বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, বিশ্ববিদ্যালয়, পোর্ট ট্রাস্ট, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান স্বায়ত্ত-শাসনের নিদর্শন। স্থানীয় লোকের প্রতিনিধি দ্বারাই এই সব প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়।

প্রাচীন ভারত—প্রাচীন ভারতেও স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রচলিত ছিল। বৈদিক যুগে গ্রামের জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত "গ্রামণী" দ্বারা গ্রাম শাসিত হইত। চন্দ্রগুপ্তের সময়েও পাটলিপুত্রের মিউনিসিপ্যাল্ শাসন ৩০ জন সভ্যের হাতে ন্যস্ত ছিল। মাদ্রাজে চোলরাজগণের আমলে (৮০০ হইতে ১৩০০ খ্রীঃ অব্দ) গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসন বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। এই সকল গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসন-সঙ্ঘের নাম ছিল "কুরম্"। বিভাগীয় রাজকর্মচারির সাধারণ নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত, কুরম্‌গুলি স্বাধীন ভাবেই নিজ কার্য নির্বাহ করিত। আধুনিক মিউনিসিপ্যালিটির মত ইহাদেরও জন-সেবা অন্যতম প্রধান কর্তব্য ছিল। এই প্রকার কতিপয় কুরম্ লইয়া একটি জেলা হইত। কয়েকটি জেলা দ্বারা একটি বিভাগ এবং কয়েকটি বিভাগ লইয়া একটি প্রদেশ গঠিত হইত। এই প্রদেশের নাম ছিল "মণ্ডলম্" এবং রাজপরিবারেরই কেহ রাজ-প্রতিনিধি-রূপে ইহা শাসন করিত। চোলরাজ্যে এইরূপ ছয়টি প্রদেশ ছিল।

ব্রিটিশ আমল—ব্রিটিশ আমলে স্বায়ত্ত-শাসন প্রথমে শহরেই প্রবর্তিত হয়। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ—এই তিনটি প্রেসিডেন্সি শহরেই প্রথম মিউনিসিপ্যালিটি সৃষ্ট হয়।* পরে ১৮৪২ সালে বাংলার মফস্বল শহরেও মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠার আইন পাশ হয়। ১৮৫০ সালে এই আইন অন্যান্য প্রদেশেও প্রয়োগ করার ব্যবস্থা হইল। ইহার পর প্রাদেশিক আইনেও বহু মিউনিসিপ্যালিটির সৃষ্টি হয়। এই সকল আইনে মিউনিসিপ্যাল্ কমিশনার দ্বারা মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালনার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু এই কমিশনারগণ সরকার কর্তৃক মনোনীত হইতেন। কাজেই তখন পর্যন্ত প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসনের দিক হইতে বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই।

---

* সর্বপ্রথমে মাদ্রাজ শহরে ১৬৮৭ সালে এক মিউনিসিপ্যাল্ কর্পোরেশন্ ও মেয়রের কোর্ট স্থাপিত হয়।

লর্ড মেয়োর প্রচেষ্টা—লর্ড মেয়োর সময়েই (১৮৬৯—৭২) প্রেসিডেন্সি শহরের বাহিরে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্তনের প্রথম প্রচেষ্টা হয়, বলা যাইতে পারে। তিনি ১৮৭০ সালে সরকারের সমস্ত শাসনই একমাত্র ভারত-সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত না রাখিয়া জেল, পুলিস, শিক্ষা, হাসপাতাল ও রাস্তাঘাট ইত্যাদির পরিচালন-ভার এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল বিষয়েরই আয় প্রাদেশিক সরকারের হাতে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এই ভাবে ১৮৭১ হইতে ১৮৭৪ সালের মধ্যে অনেক প্রদেশেই আংশিক ভাবে নির্বাচিত ও প্রতিনিধিমূলক মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপনের আইন বিধিবদ্ধ হয়।

লর্ড রিপনের প্রস্তাব—বর্তমান যুগের স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানগুলি প্রকৃতপক্ষে লর্ড রিপনের আমলেই (১৮৮০-৮৪) গড়িয়া উঠে। তিনি প্রধানত ভারতীয় জনসাধারণের স্বায়ত্ত-শাসন ও অন্যান্য রাজনৈতিক শিক্ষার জন্যই স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। এই উদ্দেশ্যে রাজকর্মচারিদেরও তিনি সর্বতোভাবেই স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠান সমূহকে সাহায্য করার নির্দেশ দেন। তাঁহার এই প্রস্তাব অনুসারে ১৮৮৩-৮৪ সালে যে সকল আইন পাশ হয়, তাহার ফলে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠান সমূহে করদাতাদের প্রতিনিধি নির্বাচন-প্রথা সম্প্রসারিত হয়। ইহা ছাড়া, কতিপয় শহরের মিউনিসিপ্যালিটিকে বে-সরকারি সভাপতি নির্বাচনের অধিকারও দেওয়া হইল। প্রাদেশিক সরকারের অধীনস্থ আরও কয়েকটি বিষয়ের আয়-ব্যয় স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানের হাতে দেওয়া হয়।

লর্ড হার্ডিঞ্জের ব্যবস্থা—লর্ড রিপনের এই ব্যবস্থাই কার্যত ১৯১৫ সন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। ১৯০৯ সালের বি-কেন্দ্রীকরণ কমিশন (De-centralisation Commission) স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন সম্পর্কে তিনটি নূতন প্রস্তাব করেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ তন্মধ্যে দুইটি প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

ফলে, (১) মিউনিসিপ্যালিটিতে অধিকাংশ সভ্যই নির্বাচন করিবার এবং (২) সাধারণ নির্বাচিত বে-সরকারি সভ্যদের মধ্য হইতেই মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি গ্রহণের ব্যবস্থা হইল। ফলে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকতর প্রসার হয়।

মিউনিসিপ্যালিটি—১৯১৮ সালে ভারত-সরকার স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে এক প্রস্তাব (Resolution) প্রকাশ করেন। সেই অনুসারে ব্যবস্থা হয় যে, **মিউনিসিপ্যালিটি** সমূহের সভাপতি অতঃপর নির্বাচিত হইবেন। বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, আসাম, বিহার-উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও পাঞ্জাব—এই আটটি প্রদেশেই মাত্র পূর্বোক্ত সংস্কার প্রবর্তিত হয়।

গঠন—মিউনিসিপ্যাল্ ক্ষমতা ও গঠন সকল প্রদেশেই সমান নহে। মাদ্রাজে এখন সকল মিউনিসিপ্যাল্ কাউন্সিলরই নির্বাচিত হন। বোম্বাইতেও প্রাদেশিক সরকারকে অনুরূপ ব্যবস্থা করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বাংলাদেশে মিউনিসিপ্যাল্ সভ্যের $\frac{2}{3}$ অংশ নির্বাচিত এবং $\frac{1}{3}$ অংশ সরকার কর্তৃক মনোনীত। হাওড়া, ঢাকা ও চট্টগ্রামে নির্বাচিত সভ্যের অনুপাত $\frac{3}{4}$ অংশ হইতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশে ১৭২৩ জনের মধ্য সরকারি সভ্য ১১০ জন ; আসামে ৩৫৬ জনের মধে; ৩৯ জন সরকারি কর্মচারি। বাংলায় সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের জন্যও ভিন্ন সভ্যপদ নির্দিষ্ট হইয়াছে। বাংলাদেশে মিউনিসিপ্যাল্-সভ্যগণ এখন ৪ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। বর্তমানে ব্রিটিশ ভারতে প্রায় ৮১২টি মিউনিসিপ্যালিটি আছে। বাংলায় কলিকাতা করপোরেশন ব্যতীত ১১৮টি মিউনিসিপ্যালিটি আছে। আসামে মিউনিসিপ্যালিটির সংখ্যা ২৭। গড়ে বাংলার মিউনিসিপ্যালিটির মাথা পিছু ৪ টাকার কিছু বেশি আয়। বাংলায় সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটির আয় এক কোটির কিছু বেশি। অর্ধলক্ষের বেশি জনসম্বলিত মিউনিসিপ্যালিটির সংখ্যা মাত্র বাংলায় ৭, মাদ্রাজে ২৩ ও যুক্তপ্রদেশে ১৭।

কার্য-সূচী — মিউনিসিপ্যালিটির করদাতাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালনা করেন। নিজ এলাকায় সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা করাই মিউনিসিপ্যালিটির কর্তব্য :—

(১) শিক্ষা ;

(২) স্বাস্থ্য (সংক্রামক ও অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ, টীকা দেওয়া, ময়লা ও আবর্জনা পরিষ্কার,, মশা-নিবারণ, হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, ভেজাল-মিশ্রিত দ্রব্য এবং দূষিত ও বাসি খাবার বিক্রয় নিবারণ ইত্যাদি) ;

(৩) আলো ও জল-সরবরাহ, জল-নিকাশ ;

(৪) বাজার স্থাপন, পথঘাট, সেতু, যান-বাহনাদি এবং শ্মশান প্রভৃতির সুব্যবস্থা ; এবং

(৫) জন্ম-মৃত্যুর হিসাব ইত্যাদি।

আয়—উপরি উক্ত এবং অন্যান্য জনহিতকর কার্যে মিউনিসিপ্যালিটির যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন হয়। নিম্নলিখিত বিষয় হইতেই মিউনিসিপ্যালিটির প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হইয়া থাকে :—

(১) সম্পত্তি, জীবিকা, ব্যবসা এবং প্রমোদ কর ;

(২) শহরে বিক্রয়ার্থ আনীত দ্রব্যাদির উপর কর ;

(৩) জল ও আলো-সরবরাহ, জল-নিকাশ এবং ময়লা পরিষ্কারের জন্য কর ;

(৪) রাস্তাঘাট, খেয়া, নৌকা ও অন্যান্য যান-বাহনাদির উপর কর এবং (৫) প্রাদেশিক সরকারের সাহায্য।

উপরি উক্ত নানাবিধ **কর** হইতেই মিউনিসিপ্যালিটির **প্রধান আয়** হইয়া থাকে। সরকারি সাহায্য এবং কর ভিন্ন অন্যান্য আয় হইতে মিউনিসিপ্যালিটি সমগ্র আয়ের মাত্র ⅙ অংশ পায়। বোম্বাই প্রভৃতি

কয়েকটি প্রগতিশীল প্রদেশের তুলনায় বাংলায় করের হারও কম, মোট আয়ও কম। বলা বাহুল্য, পর্যাপ্ত আয়ের অভাবে বহু মিউনিসিপ্যালিটিই তাহাদের কর্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে না। একুনে মিউনিসিপ্যালিটি সমূহ শিক্ষার জন্য মাত্র ৭ লাখ ও জল সরবরাহের জন্য ১৪ লাখ টাকা ব্যয় করে।

কলিকাতা কর্পোরেশন্

ভারতের মিউনিসিপ্যাল্ স্বায়ত্ত-শাসনে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ—এই কর্পোরেশন্ তিনটি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহাদের মধ্যে প্রতিটি কর্পোরেশন্ই স্বতন্ত্র আইনে গঠিত এবং ইহাদের ক্ষমতাদিও বিভিন্ন। ১৭২৭ সালে কলিকাতায় মাদ্রাজের অনুরূপ এক কর্পোরেশন্ ও মেয়রের কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন অবশ্য স্থানীয় বিবাদ নিষ্পত্তিই ছিল ইহার প্রধান কর্তব্য। কলিকাতায় প্রকৃতপক্ষে মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম সূচনা হয় ১৭৯৪ খ্রীঃ অব্দে, স্যর্ জন্ শোরের আমলে। কলিকাতা কর্পোরেশনের ক্ষমতা প্রথমে খুবই সঙ্কুচিত ছিল। **১৮৭৬ সালে** ইহা প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার লাভ করে এবং নানা পরিবর্তনের পরে **১৯২৩ সালে** স্ব-শাসন-ক্ষমতা লাভ করিল। *

মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড শাসন-সংস্কার অনুসারে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগ দেশীয় মন্ত্রীদের হাতে ন্যস্ত হয়। ১৯২৩ সনে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের তদানীন্তন মন্ত্রী স্যর্ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় **কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল্ আইন্** পাশ হয়। কলিকাতা

* বোম্বাই কর্পোরেশনে প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা হয় ১৮৭২ সালে এবং মাদ্রাজে হয় ১৮৭৮ সালে; আর, বহুলাংশে স্বায়ত্ত-শাসন ক্ষমতা বোম্বাই কর্পোরেশন লাভ করে ১৮৮৮ সালে এবং মাদ্রাজ ১৯১৯ সালে।

কর্পোরেশনের বর্তমানে যে ক্ষমতা ও অধিকার আছে, তাহার মূলে রহিয়াছে ১৯২৩ সালের এই মিউনিসিপ্যাল্ আইন। এই প্রসঙ্গে নূতন আইন অনুসারে কলিকাতার প্রথম মেয়র স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের নামও বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য।

গঠন :—১৯২৩ সালের আইন অনুসারে কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রায় ৪/৫ অংশ সভ্য (Councillor) নির্বাচিত হইতেছে। তদবধি ইহার প্রধান পরিচালকের নাম হইয়াছে মেয়র। ১৯৩৩ সালের সংশোধন আইনে স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক নির্বাচন রহিত হয় এবং সভ্য-সংখ্যা ৯৬ হয়। পরে আর একটি সংশোধন আইনে কলিকাতা কর্পোরেশন্ হইতে গার্ডেন্ রীচ্ মিউনিসিপ্যালিটিকে পৃথক্ করিয়া, কর্পোরেশনের সভ্য-সংখ্যা ৯৬ হইতে ৯২ করা হয়।

কিন্তু সম্প্রতি ১৯৩৯ সালে কলিকাতা কর্পোরেশন্ সম্পর্কে এক নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। আইন সভায় প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও এই আইনে পুনরায় **স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক নির্বাচন**-এর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই আইন অনুসারে কর্পোরেশনে মোট ৯৮ জন সভ্য থাকিবেন। এই ৯৮ জন সভ্যের মধ্যে সাধারণ ৪৭ জন (তন্মধ্যে ৪ জন অনুন্নত সম্প্রদায় হইতে); মুসলমান ২২; ইঙ্গ-ভারতীয় (Anglo-Indian) ২; বেঙ্গল্ চেম্বার্ অব্ কমার্স (Bengal Chamber of Commerce) ৬; কলিকাতা ট্রেড্স এ্যাসোসিয়েশন্ (Calcutta Trades Association) ৪; কলিকাতা-পোর্ট ট্রাস্ট (Calcutta Port Trust) ২, শ্রমিক প্রতিনিধি ২; এবং সরকার কর্তৃক মনোনীত ৮ (তন্মধ্যে ৩ জন অনুন্নত সম্প্রদায় হইতে)। এই ৮৫ জন নির্বাচিত এবং ৮ জন মনোনীত সভ্যেরা মিলিয়া ৫ জন অল্ডারম্যান্ নির্বাচন করিবেন। পূর্বের মতই এই সকল সভ্য এবং অল্ডারম্যান্ নিজেদের মধ্য হইতে কর্পোরেশনের সভাপতি বা **মেয়র** (Mayor)* এবং

সহকারি সভাপতি বা **ডেপুটি মেয়র** (Deputy Mayor) নির্বাচিত করিবেন। ইঁহারা সকলেই পূর্বের মত ৩ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন এবং বিনা বেতনে জন-সেবার নিমিত্ত কর্পোরেশনের রীতিনীতি পরিচালনা করিবেন। পুরুষ ও মহিলা সকলেই সভ্য নির্বাচনে ভোট দিতে পারেন; কিন্তু কর্পোরেশনে বাৎসরিক ১২ টাকা কর বা ৬ টাকা ফি ইত্যাদি না দিলে এবং অন্তত ২১ বৎসর বয়স না হইলে, কেহ ভোট দিতে পারে না।

কর্ম-বিভাগ (Executive) :—সাধারণ সভ্য, অল্ডারম্যান্, মেয়র এবং ডেপুটি মেয়র লইয়া গঠিত কর্পোরেশন্-সভার (Corporation
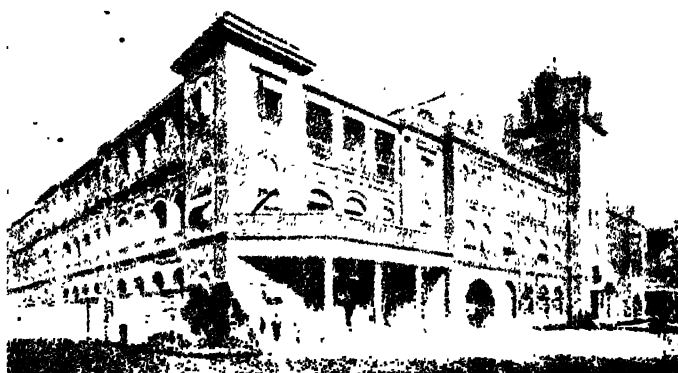
কলিকাতা কর্পোরেশনের আপিস ও সভাগৃহ

Council) হাতেই, কর্পোরেশনের প্রয়োজনীয় বিধানাদি প্রণয়নের ভার রহিয়াছে। কর্ম-বিভাগ এই সভার নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণাধীনে উহার বিধান সমূহ কার্যে পরিণত করিয়া থাকে। চীফ্ এক্জিকিউটিভ্ অফিসারই (Chief Executive Officer) কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা। ইহা ব্যতীত, কর্পোরেশনে ২ জন ডেপুটি

একজিকিউটিভ্ অফিসার্ এবং চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার্, হেল্থ্ অফিসার ইত্যাদি অন্যান্য কর্মচারীও আছেন। এই সকল প্রধান প্রধান কর্মচারির নিয়োগ, বেতন ও পদচ্যুতি প্রভৃতি কর্পোরেশন্-সভার হাতেই ন্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে প্রাদেশিক সরকারের সম্মতির প্রয়োজন। * কর্পোরেশনের একটি দপ্তরখানাও (Secretariate) আছে।

কার্য-সূচী—নিজ এলাকায় সাধারণত নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করাই কর্পোরেশনের কর্তব্য:—

(১) শিক্ষা ;

(২) স্বাস্থ্য ;

(৩) জল ও আলো সরবরাহ, জল-নিকাশ ;

(৪) রাস্তাঘাট, ভ্রমণোদ্যান (Park) ;

(৫) বস্তি-উন্নয়ন, বাসগৃহাদি নির্মাণ, জীর্ণ ও বিপজ্জনক অট্টালিকা প্রভৃতি অপসারণ ;

(৬) কল-কারখানা, বাজার এবং ব্যবসায়ের জন্য ব্যবহৃত গৃহাদি পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ ; এবং

(৭) জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রক্ষা এবং শ্মশান ও কারখানা সমূহের ব্যবস্থা।

কর্পোরেশন্ শিক্ষা বিস্তারের জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতেছে। প্রাথমিক শিক্ষাই অবশ্য ইহার প্রধান লক্ষ্য। কর্পোরেশন্ ক্রমে ক্রমে প্রতি ওয়ার্ডে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রচলনের জন্যও ব্যবস্থা করিতেছে। ১৯২৩-২৪ সালে কর্পোরেশনের অধীনে মাত্র ১৯টি **অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়** ছিল ; বর্তমানে আছে প্রায় আড়াইশ'টি।

* বোম্বাই ও মাদ্রাজ কর্পোরেশন্-এর এখনও বে-সরকারি চীফ্ এক্‌জিকিউটিভ্ অফিসার নিযুক্ত করার ক্ষমতা নাই।

ইহা ব্যতীত, জনশিক্ষার নিমিত্ত পাঠাগার, মধ্য ও উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়, শিল্প-শিক্ষালয় প্রভৃতির জন্যও কর্পোরেশন্ আর্থিক সাহায্য করে।

জন-স্বাস্থ্যের জন্যও কর্পোরেশন্ প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। সংক্রামক রোগ নিবারণ, টীকা দেওয়া, হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয়ে অর্থসাহায্য, প্রসূতি-সদন স্থাপন ইত্যাদি নানাবিধ কার্যই কর্পোরেশন্ করিয়া আসিতেছে। ইহা ছাড়া, কর্পোরেশন্ কোথাও কোথাও ইতিমধ্যেই গরীব শিশুদের জন্য বিনামূল্যে দুগ্ধ বিতরণ আরম্ভ করিয়াছে। আবার, ভেজাল-মিশ্রিত দ্রব্যাদি এবং বাসি ও দূষিত খাবার যাহাতে ক্রয়-বিক্রয় না হয়, সেদিকের ইহার বিশেষ দৃষ্টি রহিয়াছে। অধুনা ইহা দেশীয় পণ্যাদি সংক্রান্ত একটি মিউজিয়ামও প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

আয়—কর্পোরেশনের কর্তব্য সম্পাদনে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হয়। সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি হইতেই উহার আয় হইয়া থাকে :—

(১) জল, যান-বাহন, পশু, দোকানপাট এবং জীবিকা (profession) ও ব্যবসা (trades) প্রভৃতির উপর কর ;

(২) নিজ এলাকাধীন গৃহাদি ও ভূমির বাৎসরিক মূল্যের উপর শতকরা ২০ টাকা কর ;

(৩) কর্পোরেশনের নিজ সম্পত্তির আয় ও বাজার প্রভৃতির উপর কর ;

(৪) সময় সময় সমুদ্রগামী জাহাজের নিকট জল বিক্রয়ের অর্থ, মিউনিসিপ্যাল্ ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে আদায়ীকৃত জরিমানা এবং অন্যান্য ফি ; এবং

(৫) সরকারি সাহায্য।

কলিকাতা কর্পোরেশনের বাৎসরিক আয় প্রায় পৌনে চার কোটি টাকা। ইহার মধ্যে দুই কোটি গৃহাদি ও ভূমিকর হইতেই সংগৃহীত হয়।

কলিকাতার জনসংখ্যা ১১১/২ লক্ষেরও অধিক। কলিকাতায় মাথা পিছু করভার ১৭ টাকার কিছু কম, বোম্বাইতে এই করভার মাথা পিছু ২২॥০ ও মাদ্রাজে প্রায় ৭১/২ টাকা।

ইম্ প্রুভ্ মেণ্ট্ ট্রাস্ট্—জনবহুল নগরের সংস্কার ও উন্নতি সাধনের জন্য ইম্প্রুভ্মেণ্ট ট্রাস্ট্ (Improvement Trust) নামক আর এক প্রকার স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। অন্যান্য দেশের মত এদেশেও কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি বড় বড় নগরে এই প্রকার উন্নতিবিধায়িনী সমিতি বা ইম্প্রুভ্মেণ্ট্ ট্রাস্ট্ স্থাপিত হইয়াছে। ১৮৯৬ সালের প্লেগ মহামারীর পরে এদেশে এক স্বাস্থ্য-তদন্ত কমিটি বসে। পরে ১৯১১ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা কলিকাতা-উন্নয়ন-আইন (Calcutta Improvement Act) পাশ করে। এই আইনেই কলিকাতা ইম্প্রুভ্মেণ্ট্ ট্রাস্ট্ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ট্রাস্ট্কে কলিকাতা নগরীর বিস্তৃতি ও উন্নতির পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য জনসাধারণ ও প্রতিষ্ঠানাদির উপর কর ধার্যের ক্ষমতাও দেওয়া হইল। ট্রাস্ট্বোর্ডের গঠন এবং একজন বেতনভোগী সভাপতি নিয়োগের ব্যবস্থাও এই আইনে করা হইয়াছিল।

কলিকাতা ট্রাস্ট্-বোর্ডের সভ্য-সংখ্যা ১০, ইহাদের মধ্যে ৪ জন সরকার কর্তৃক নিযুক্ত। বাকি ৬ জনের মধ্যে ৪ জন কর্পোরেশন্-হইতে (তন্মধ্যে চীফ্ এক্জিকিউটিভ্ অফিসার ১ জন, নির্বাচিত সভ্যদের প্রতিনিধি ১ জন এবং মনোনীত সভ্যদের প্রতিনিধি ১ জন ও অন্য প্রতিনিধি একজন); বেঙ্গল চেম্বার্ অব্ কমার্স্ হইতে ১ জন; এবং বেঙ্গল্ ন্যাশনাল্ চেম্বার্ অব্ কমার্স হইতে ১ জন।

এই ট্রাস্ট কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে বৎসরে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা পায়। পাট এবং যাত্রাশেষে যাত্রী ও মালের উপর ধার্য প্রান্তিক কর (Terminal Tax) হইতেও ইহার কিছু আয় আছে। রাস্তাঘাট সংস্কার ও

ভ্রমণোদ্যান প্রভৃতি স্থাপনের ফলে বাসগৃহাদি ও ভূমির যে উন্নতি হয়, সেইজন্য উন্নয়ন-কর (Betterment fee) ধার্য করিয়াও ট্রাস্ট্ অর্থ পাইয়া থাকে। এই সকল অর্থ দ্বারা ট্রাস্ট্ অস্বাস্থ্যকর স্থানে নূতন ও প্রশস্ত রাস্তা, সেতু ও ভ্রমণোদ্যান প্রভৃতি নির্মান করিয়া নগরের নানা স্থানে আবার গরীব ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণের অল্প ভাড়ায় বসবাসের জন্য গৃহাদিও নির্মাণ করিয়া থাকে। জন-সেবার দিক দিয়া ইহার যথেষ্ট সার্থকতা আছে। ইহা বর্তমানে বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ, ঢাকুরিয়া, নারিকেলডাঙ্গা, বরাহনগর, কাশিপুর প্রভৃতি অঞ্চলের উন্নতিসাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছে।

পোর্ট ট্রাস্ট্—কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, করাচী ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি সামুদ্রিক বন্দরগুলির পরিচালনা-ভার পোর্ট ট্রাস্ট্ নামক এক একটি সঙ্ঘের উপর ন্যস্ত। নির্দিষ্ট সংখ্যক সরকারি, বে-সরকারি, নির্বাচিত ও মনোনীত সভ্য লইয়া বিভিন্ন বন্দরের ট্রাস্ট্গুলি গঠিত। প্রতি ট্রাস্টেই ১ জন করিয়া বেতনভোগী সভাপতি ও ১ জন সহকারি সভাপতি নিযুক্ত হইয়া থাকেন। এতদিন স্থানীয় প্রাদেশিক সরকারের অধীনে ট্রাস্ট্গুলি আংশিক স্বায়ত্ত-শাসন ভোগ করিয়া আসিতেছিল। নূতন শাসন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বন্দরগুলির পরিচালনভার ভারত-সরকারের হাতেই ন্যস্ত হইয়াছে। বন্দরে মাল ও যাত্রিবাহী জাহাজাদির প্রবেশ ও নির্গম এবং গুদাম নির্মাণ প্রভৃতির ব্যবস্থা নির্ধারণই পোর্ট ট্রাস্টের প্রধান কর্তব্য।

কলিকাতা পোর্ট ট্রাস্টে মোট ১৯ জন সভ্য; তন্মধ্যে ১২ জন নির্বাচিত ও ৭ জন মনোনীত। ইহাতে ইউরোপীয় সভ্যদের সংখ্যাই বেশি। কলিকাতা পোর্ট ট্রাস্টের ৩ কোটি টাকার উপর আয়। ভারতের সমস্ত পোর্ট ট্রাস্টের আয় প্রায় সাড়ে সাত ক্রোড়।

জেলা-বোর্ড

কেবল মাত্র শহরের উন্নতির জন্যই মিউনিসিপ্যালিটির সৃষ্টি। তাই মিউনিসিপ্যাল্ এলাকার বাহিরে জেলার অন্যান্য অঞ্চলের উন্নতির জন্য জেলা-বোর্ড ও লোক্যাল-বোর্ড গঠিত হয়। ১৮৮২ সালে লর্ড রিপনের আমলেই প্রথম এই বোর্ডগুলির সৃষ্টি হয়। কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটির তুলনায় ইহাদের উন্নতি তেমন দ্রুত হয় নাই। ভারতে জেলা-বোর্ডের গঠন প্রভৃতি মূলত **১৮৮৫ সালের** স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন আইন অনুসারেই নিয়মিত। ব্রিটিশ ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই জেলা-বোর্ড রহিয়াছে। জেলা-বোর্ডের সভ্য নির্বাচন প্রথা বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রকার।

১৯১৭ সালে জেলা-বোর্ড ও লোক্যাল-বোর্ড সমূহে অধিক সংখ্যক সভ্যই নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়। তখন উহাদিগকে বিভাগীয় কমিশনার্ বা উচ্চকর্তৃপক্ষের সম্মতি লইয়া বে-সরকারি সভ্যের ভোটাধিক্যে সভাপতি নির্বাচনের অধিকারও দেওয়া হয়। এই সময় কর, আয়-ব্যয় জন-সেবা এবং নিজ কর্মচারি নিয়োগ সম্বন্ধে বোর্ডসমূহকে মিউনিসিপ্যালিটির অনুরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইল। মাত্র বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও আসামেই এইরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ১৯২০ সন হইতে এই প্রদেশগুলিতে সকল জেলা-বোর্ডেরই (বাংলায় দার্জিলিং জেলা-বোর্ড ব্যতীত সভ্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে সভাপতি নির্বাচন করিয়া আসিতেছেন। ইহাদের সভ্য মনোনীত করিবার ভার রহিয়াছে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের মন্ত্রীর হাতে। মণ্টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কারের পরেও জেলাবাসীদের শতকরা প্রায় ৩ জন মাত্র জেলা-বোর্ডের সভ্য নির্বাচনে ভোটাধিকার পাইয়াছেন।

বাংলা দেশে প্রত্যেক জেলা-বোর্ডেরই সভ্য সংখ্যা সরকার নির্দিষ্ট

করিয়া দেন ; কিন্তু কোন জেলা-বোর্ডেই ৯ জনের কম সভ্য হইতে পারে না। মনোনীত সভ্য অপেক্ষা নির্বাচিত সভ্য-সংখ্যাই বেশি। স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের মন্ত্রীই সভ্য মনোনয়ন করেন। এই মনোনীত সভ্যদের অর্ধেক সরকারি কর্মচারি হইতে সংগৃহীত হইতে পারে। সাব্ডিভিশন্যাল্ অফিসারগণ প্রায়ই জেলা-বোর্ডের সভ্য হইয়া থাকেন। ৪ অংশ সভ্যেরই কার্যকাল ৫ বৎসর। সভ্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন চেয়ার্ম্যান্ বা সভাপতি এবং একজন ভাইস-চেয়ার্ম্যান্ বা সহকারি সভাপতি নির্বাচন করেন। ইঁহারা কেহই কিন্তু বেতন পান না। লোক্যাল্ বোর্ডসমূহ * নিজ সভ্য বা বাহিরের লোক হইতে জেলা-বোর্ডের অন্তত ¾ অংশ সভ্য নির্বাচন করিতে পারে।

কার্য-সূচী—সাধারণত নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করাই জেলা-বোর্ডের কার্য :—

(১) শিক্ষা (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য জেলা-বোর্ড অর্থ সাহায্য করিয়া থাকে);

(২) জন-স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা (টীকা, দাতব্য চিকিৎসালয়, হাসপাতাল ইত্যাদি) ;

(৩) পানীয় জল, পথঘাট, সেতু ও বাজার ;

(৪) খোঁয়াড় ও খেয়া ; এবং

(৫) দুর্ভিক্ষ নিবারণ, লোক-গণনা ইত্যাদি ।

আয়—জেলা-বোর্ডের সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয় হইতে আয় হইয়া থাকে :—

(১) সরকারি সাহায্য ;

(২) ভূমিকর ও পথকর ;

* লোক্যাল-বোর্ড উঠিয়া গেলে জেলা-বোর্ডের সভ্যগণ বর্তমান নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক সরাসরি ভাবে নির্বাচিত হইবেন।

(৩) বাজার, খোঁয়াড় ও খেয়া ; এবং

(৪) যান-বাহনাদির উপর কর ইত্যাদি।

এই আয় হইতেই উপরি উক্ত কার্যাদির ব্যয় নির্বাহ হয়। বাংলাদেশে মোট ২৬টি জেলা-বোর্ড আছে। ইহাদের মোট সভ্য-সংখ্যা প্রায় সাত শত; ইহার ⅔ অংশ নির্বাচিত সভ্য। উহাদের মোট আয় ২ কোটি টাকারও কম।

অধুনা বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইন (১৯৩০) অনুসারে কয়েকটি জেলা-বোর্ড প্রয়োজনীয় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছে এবং অতিরিক্ত শিক্ষা-কর আদায় করিতেছে।

লোক্যাল্ বোর্ড—প্রতি মহকুমা লইয়া বাংলায় লোক্যাল বোর্ড, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তালুক বোর্ড এবং যুক্ত প্রদেশে সাব্‌ডিস্টিক্ট বোর্ড স্থাপিত হয়। লোক্যাল বোর্ডের সভ্যগণ ৫ বৎসরের জন্য নির্বাচিত বা মনোনীত হইয়া থাকেন। বাংলার লোক্যাল বোর্ড সমূহে ছয়জনের কম সভ্য হইতে পারিবে না বলিয়া আইন হইয়াছিল ; কার্যত এই সব বোর্ডে ৯ হইতে ৩০ জন সভ্য থাকেন। সভ্যেরা নিজেদের মধ্য হইতে সভাপতি নির্বাচন করেন। মনোনীত সভ্য অপেক্ষা নির্বাচিত বে-সরকারি সভ্য-সংখ্যাই বেশি। সরকার বোর্ডের সভ্য-সংখ্যা নির্ধারণ করিয়া, উহাদের ⅓ অংশ মনোনয়ন করেন।

জেলা-বোর্ড জন-সেবার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থা করিবে এবং লোক্যাল্ বোর্ড উহার অধীনে ঐ সমস্ত বিধান কার্যে পরিণত করিবে, এই উদ্দেশ্য লইয়াই প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে লোক্যাল বোর্ডের স্থষ্টি হয়। কিন্তু বর্তমানে লোক্যাল্ বোর্ড সমূহ জেলা-বোর্ডের মত নিজ এলাকার শিক্ষা স্বাস্থ্য ও যাতায়াত প্রভৃতির সুব্যবস্থা করিয়া থাকে। বাংলার লোক্যাল্-বোর্ড সমূহ জেলা-বোর্ডের আর্থিক সাহায্যের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে ; ইহাদের স্বতন্ত্র কোন আয়ের পন্থা নাই। জেলা-বোর্ড

এবং গ্রাম্য ইউনিয়ন বোর্ডের মধ্যে লোক্যাল্ বোর্ডের তেমন কোন প্রয়োজনীয়তা নাই মনে করিয়া বাংলার আইন-সভা ১৯৩৬ খ্রীঃ অব্দে (স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন সংশোধন আইনে) জেলা-বোর্ডকে অধীনস্থ লোক্যাল্ বোর্ড তুলিয়া দিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। বহু লোক্যাল্ বোর্ড ইতিমধ্যেই উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ—পঞ্চায়েৎ ভারতের এক অতি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। সেকালে প্রাচীন ভারতে পল্লীসমূহের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, রাস্তাঘাট, বিবাদ নিষ্পত্তি, এমন কি কৃষি ও ভূমি ব্যবস্থা প্রভৃতিও পঞ্চায়েতের হাত ছিল। গ্রামের পাঁচজন মান্য-গণ্য লোক লইয়া এই পঞ্চায়েৎ সভা গড়িয়া উঠিত। তাই ইহাকে বলা হইত পঞ্চায়েৎ। অবশ্য, পঞ্চায়েতে যে ঠিক পাঁচজনের বেশি লোক থাকিত না, এমন নহে। গ্রামে তখন একতা ছিল। তাই ধনী, গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই এই পঞ্চায়েতের নির্দেশ মানিয়া চলিত। কিন্তু ইংরেজ বিজয়ের পরে শহুরে ও যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে, ভারতের সভ্যতা, প্রাচীন সমাজ—সব কিছুতেই ভাঙ্গন দেখা দিল। পরে, এদেশে ইংরেজ প্রতিষ্ঠার প্রথম ভাগে, সেকালের গ্রাম্য-পঞ্চায়েৎগুলি তুলিয়া দেওয়া হইল। অথচ, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন সু-প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সর্বাগ্রে গ্রাম্য-পঞ্চায়েৎ বা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন প্রয়োজন। কিন্তু গ্রামে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কম বলিয়া প্রথমে এই বিষয়ে তেমন চেষ্টা হয় নাই।

ইংরেজ আমলে বাংলা দেশে গ্রাম্য-পঞ্চায়েৎ প্রথার প্রথম সূচনা হয় ১৮৭০ সালের চৌকিদারি আইনে। এই আইনে গ্রাম্য-পঞ্চায়েৎ সমূহ কর বসাইয়া সরকারি পুলিসের নিয়মাধীনে গ্রামে চৌকিদারি পাহারার ব্যবস্থা করিতে পারিত। কিন্তু জনগণের শ্রীবৃদ্ধি-মূলক অন্য কোন কার্যের অধিকার ইহাদের ছিল না।

অধুনা পঞ্চায়েৎ সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া গ্রামোন্নয়ন ও অন্যান্য কার্যের

ভার উহাদের হস্তে দিবার প্রয়াস দেখা যাইতেছে। প্রাদেশিক সরকার কিছু অর্থসাহায্য করিয়া আর্থিক দায়িত্বও উহাদের উপরই প্রধানত দিতে চাহিতেছেন। এই পদ্ধতিতে পাঞ্জাব ও বিহারে এবং অন্য প্রদেশেও আইন পাশ হইতেছে। এই সব সভাকে বিচার ক্ষমতাও দেওয়া হইতেছে।]

ইউনিয়ন বোর্ড—১৯১৯ সালে বঙ্গীয় আইন সভায় পল্লী স্বায়ত্ত-শাসন আইন পাশ হয়। এই আইনে পল্লীর শ্রী ও সমৃদ্ধি ফিরাইয়া আনিবার জন্য সেকালের পঞ্চায়েৎ সভার আদর্শে ইউনিয়ন্ বোর্ড প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইল। আগে প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া পঞ্চায়েৎ সভা ছিল। এই আইনে কিন্তু ৪।৫টি গ্রাম লইয়া একটি ইউনিয়ন্ গঠনের ব্যবস্থা হয়। প্রত্যেকটি ইউনিয়নে একটি বোর্ড বা সভা আছে। এই বোর্ডের সভ্য-সংখ্যা স্থানীয় সরকারই নির্ধারণ করেন। তবে বাংলাদেশে প্রতি ইউনিয়ন্ বোর্ডে ৬ জন হইতে ৯ জন পর্যন্ত সভ্য থাকেন। সভ্যদের ⅔ অংশ ইউনিয়ন্‌বাসী করদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত হ'ন। অপর সভ্যেরা জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন। এই নির্বাচিত ও মনোনীত সভ্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে সভাপতি এবং সহকারি সভাপতি নির্বাচন করেন। কিন্তু জেলা-বোর্ডের সম্মতি ছাড়া, উঁহারা ঐ সভাপতিকে পদচ্যুত করিতে পারেন না। এই সকল সভ্যদের কার্য-কাল ৪ বৎসর। ইঁহারা সকলেই কিন্তু জন-সেবার জন্য বিনা বেতনে কাজ করিয়া থাকেন। প্রতি ৪ বৎসর অন্তর নূতন বোর্ড গঠিত হয়।

অন্তত ২১ বৎসর বয়স্ক যে সকল গ্রামবাসী কম পক্ষে ৬ আনা ইউনিয়ন্ রেট্ বা কর দেন, তাঁহারা এই বোর্ডের সভ্য নির্বাচনে ভোট দিতে পারেন। যাঁহারা মধ্য ইংরেজি, মধ্যবাংলা বা জুনিয়র মাদ্রাসা পরীক্ষায় পাশ করিয়াছেন, তাঁহারাও ২১ বৎসর বয়স্ক হইলে, ভোট দিতে পারেন।

কার্য-সূচী—মোটামুটি নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে নিজ নিজ এলাকায় যথোচিত ব্যবস্থা করাই ইউনিয়ন্ বোর্ডের কার্য :—

(১) কুটির-শিল্প ও প্রাথমিক শিক্ষা ;

(২) স্বাস্থ্য ও দাতব্য চিকিৎসালয় ;

(৩) পথঘাট ও সেতু ;

(৪) খোঁয়াড় ;

(৫) জল সরবরাহ (টিউব্-ওয়েল্ স্থাপন, পুষ্করিণী খনন ইত্যাদি), জল নিকাশ ও আবর্জনা পরিষ্কার ;

(৬) শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা (চৌকিদারের ব্যবস্থা) ;

(৭) জন্ম মৃত্যুর হিসাব রাখা ; এবং

(৮) ছোট ছোট দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচার।

কার্যত, অর্থাভাবে পল্লীর শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার এবং সেই উদ্দেশ্যে চৌকিদারের ব্যবস্থা করাই এই বোর্ডের প্রধান কার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্তমানে এই চৌকিদারের ব্যয় প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে আদায় করিবার চেষ্টা চলিতেছে। কুটির-শিল্প ও প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আর্থিক সাহায্য করা এবং কৃষি ও শিল্প-শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেওয়ার ক্ষমতাও ইহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে ; এ সম্পর্কে আশু সুব্যবস্থা পল্লীর উন্নতির জন্য প্রয়োজন।

আয়—উপরি উক্ত কর্তব্য সম্পাদনে বোর্ডের যে ব্যয় হয়, তাহা নির্বাহের জন্য উহার নিম্নলিখিত আয়ের পন্থা রহিয়াছে :—

(১) ইউনিয়ন্ রেট্ বা কর ;

(২) খোঁয়াড় ও খেয়ার মাশুল ; এবং

(৩) জেলা-বোর্ড ও সরকারের দান।

জেলা-বোর্ডের প্রতিনিধি হিসাবে বা উহার সাধারণ নিয়ন্ত্রণাধীন ইউনিয়ন্ বোর্ডকে কাজ করিতে হয়। জেলা-বোর্ড এইজন্য উহাকে অর্থ

সাহায্য করে। জেলা-বোর্ডের বিনা সম্মতিতে ইউনিয়ন্ বোর্ড কোন ব্যয় বা ঋণ করিতে পারে না।

ছোট ছোট ফৌজদারি ও দেওয়ানি বিচারের জন্য কোন কোন ইউনিয়নে যথাক্রমে ইউনিয়ন্ বেঞ্চ ও ইউনিয়ন্ কোর্ট রহিয়াছে। *

বাংলায় ইউনিয়ন্ বোর্ডের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। প্রায় এক কোটি টাকা উহাদের সমবেত আয়। কিঞ্চিদধিক ২৬ লক্ষ ভোটার নিজ নিজ এলাকায় ইউনিয়ন্ বোর্ড সমূহের ৪০ হাজারের উপর সভ্য নির্বাচন করিবার অধিকার পাইয়াছে।

পল্লীসমূহই প্রদেশের প্রাণ। এই পল্লীকে ভিত্তি করিয়াই ভারতের সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষে আজিও শতকরা ৮৯ জনই গ্রামবাসী। ভারতে গ্রাম আছে প্রায় ৭ লক্ষ। পল্লীর উন্নতিতেই তাই ভারতের উন্নতি, পল্লীর সুখেই তাহার সুখ। পল্লী স্বায়ত্ত-শাসন-প্রথা ভারতের প্রাচীন শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল। ইহাই ভারতবাসীকে সামাজিক, রাজনৈতিক এক কথায়, জীবনের প্রতি বিভাগেই সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন, তথা সমষ্টিগত মঙ্গলসাধনের শিক্ষা-ক্ষেত্র হিসাবে, ইহার মূল্য অপরিমেয়, সন্দেহ নাই।

* ৭ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য

ব্রিটিশ ভারত

প্রদেশ	আয়তন (বর্গ মাইল)	লোক-সংখ্যা	মুসলমান	সাধারণ (হিন্দু-আদি)	শহরবাসী	শতকরা লিখন পঠনক্ষম
মাদ্রাজ	১৪২,২৭৭	৪৬,৭৪০,১০৭	৩,৩০৫,২৩৭	৪৩,৪৩৪,১৭০	৬,৩৩৭,২৫৬	৪'৫
বোম্বাই	৭৭২২১	১৭.৯৯২,০৫৩	১,৬০২,৩৮৫	১৫,৬০২,৯৩২	৪,২০২,৫৭৮	৯'১
সিন্ধু	৪৬৩৭৮	৩,৮৮৭,০৭০	৩,৮৩০,৮০০	১,০১৫,২২৫	৬৯৯,৩০৭	
বাঙলা	৭৭৫২১	৫০,১১৪,০০২	২৭.৪৯৭,৬২৪	৩০,৬১৬,৩৭৮	৩,৬৮৪,৩৩০	৯'৩
যুক্তপ্রদেশ	১০৬,২৪৮	৪৮,৪০৮,৭৬৩	৭,১৮১,৯২৭	৪০.৯০৫,৫৮৬	৫,৪২৪,৬২১	৪'৭
পাঞ্জাব	৯৯,২০০	২৩.৫৮০,৮৫২	১৩,৩০২,১৯১	৬,৩২৮,৫১৫	৩,০৬৭,৪৬৪	৫'০
বিহার	৬৯,৩৪৮	৩২,৩৭১,৪৩৪	৪,১৪০,৩২৭	২৮,১৯৪,৬২১	১,১৫২,১১৭	৪'৬
উড়িষ্যা	১৩,৭০৬	৫,৩০৬,১৪২	১৭১,২৩৩	৮,০৪৩,০১৮	১৯১.৪২৯	
মধ্যপ্রদেশ	৯৯,৯২০	১৫,৫০৭,৭২৩	৬৮২,৮৫৪	১৪,৮১৫,০৫৪	১,৬৬৮.৪৭০	৫'৬
আসাম	৫৫,০১৪	৮,৬২২,২৫১	২,৭৫৩,৫৬৩	৪,৮৫৮,৭৭৯	২১৩,৭২১	৬'৬
উ, প, সীমান্ত প্রদেশ	১৩,৫১৮	২,৪২৫,০৭৬	২,২২৭,৩০৩	১৪২,৯৭৭	৩৮৬,১৭৭	৪'১
বেলুচিস্তান	৫৪,২২৮	৪৬৩,৫০৮	৪০৫,৩০৯	৫৮,১৯৯	৯২,০২৫	৯'৯
আজমীর মাড়ওয়ার	২,৭১১	৫৬০,২৯২	৯৭,১৩৩	৬৩,১৫৯	১৮০,১৯৯	১'০৫
কুর্গ	১,৫৯৩	১৬৩,৩২৭	১৩,৭৭৭	৪৯,৫৫০	৯,৮২৭	৫'৫
দিল্লী	৫৭৩	৬৩৬,২৪৪	২০৬,৯৬০	৪২৯,২৮৬	৪৪৭,৪৪২	১৪'০৬
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	৩,১৪৩	২৯,৪৬৩	৬,৭১৯	২২,৭৪৪	—	১৩'৮
মোট	৮৬২,৬০১	২৫৭,৮০৮,৩০৯	৬৭,০২০,৪৪৩	২০৪,৪১১,১০৬	২৮,০৮৬,৯৫৪	৭'৪

করদ ও মিত্ররাজ্য

দেশীয় রাজ্য	আয়তন (বর্গমাইল)	লোক সংখ্যা	মুসলমান	সাধারণ (হিন্দু-আদি)	শহরবাসী	শতকরা লিখন-পঠনক্ষম
আসাম	১২,৩২০	৬২৫,৬০৬	২৪,৬০০	৬০১,০০৬	১০২,৪৯৬	৬'৯
বেলুচিস্থান	৮০,৪১০	৪০৫,১০৯	৩৯২,৭৮৪	১১২,৩২৫	১০,৫৭৭	৯'৯
বরদা	৮,১৬৪	২,৪৪৩,০০৭	৮২,৬৩০	২,২৬০,৩৭৭	৫২৩,০০৩	১৭'৮
বাঙলা	৫,৪৩৪	৯৭৩,৩৩৬	৩১৭,৪৭৬	৬০০,৮৬০	২৭,৬১০	৫'১
বিহার, উড়িষ্যা	২৮,৬৪৮	৪,৬৫২,০০৭	১৯,৫১৬	৪,৬৩২,৪৯১	৪৫,৭১৫	৩ ২
বোম্বাই ও সিন্ধু	২৭,৯৯৪	৪,৪৬৮,৩৯৬	৪১৪,৯৩১	৪,০৫৪,৪৬৫	৬০৭,৪৬৩	৫ ৯
মধ্যভারতীয় রাজ্য	৫১,৫৯৭	৬৩২,৭৯০	৩৭৬,৬৩৭	৬,২৫৬,১৫৩	৬৭৭,৭৭০	৪ ৪
মধ্যপ্রদেশ	৩১,১৭৫	২,৪৮৩,২১৪	২৩,২৫৪	২,৪৫৯,৯৬০	৭৫,০৬৫	১'৮
গোয়ালিয়র	২৬,৩৬৭	৩,৫২৩,০৭০	২০৪,২৯৭	৩,৩১৮,৭৭৩	৩৯৫,৩০৯	৪'০
হায়দ্রাবাদ	৮২,৪৯৮	১৪,৪৩৬,১৪৮	১,২৩৪,৬৬৬	১২,৯০১,৪৮২	১,৬১৬,৯৮১	৪'১
জম্মু ও কাশ্মীর	৪,৫১৬	৩,৬৪৬,২৪৩	২,৮১৭,৬৩৬	৮৪৯,৬০৭	৩৪২,৩১৪	৩ ৪
মান্দ্রাজ	১০,৬৯৮	৬,৭৫৪,৪৮৪	৪৬৭,৩৯৬	৫,২৮৭,০৮৮	৮৩৭,৫০৯	২৩'৭
মহীশূর	২৯,৩২৬	৬,৫৫৭,৩০২	৩৯৮,৬২৮	৬,১৫৮,৬৭৪	১,০৪৫,০৪২	৯'১
উ, প, সীমান্তপ্রদেশ	২২,৮৩৮	২,২৫৯,২৮৮	২৩,০৮৬	২৩,৩৬৫	—	'৭৮
পাঞ্জাব	৫,৮২০	৪৩৭,৭৮৭	৪০,৮৪৫	৩৯৬,৯৪২	১৪,৫৩৪	৩'৬
পাঞ্জাবস্টেট্ এজেন্সি	৩১,২৪১	৫,৪৭২,২১৮	১৫৫৬, ৯১	২,৯১৫,৬২৭	৪৩৯,৪৫১	৩'৫
রাজপুতানা	১২৯,০৫৯	১১,২২৫,৭১২	১,০৬৯,৩২৫	১০,১৫৬,৩৮৭	১,৫৫৬,৩০৫	৩'৫
সিকিম	২,৮১৮	১০৯,৮০৮	১০৪	১০৯,৭০৪	—	২'৯
• যুক্তপ্রদেশ	৫,৯৪৩	১,২০৬,০৭০	২৫২,১৩১	৯৫৩,৯৩৯	১২৬,১৩৮	৪'১
পশ্চিম ভারত স্টেট্ এজেন্সি	৩৫,৩৪২	৩,৯৯৯,২৫০	৫৪৫,৫৬৭	৩,৪৫৩,৬৮৩	৮৮৩,৭৭৬	১০'৫
মোট	৭১২,৫০৮	৮১,৩১০,৮৪৫	১০,৬৫৭,১০২	৬,৪৪০,৯০৬	৯,৩২৬,৯৫৮	১০'৬

পরিশিষ্ট

TYPICAL QUESTIONS

Chapter One

(1) "The Indian Councils Act of 1861 sowed the seed of representative institutions and the seed was quickened by the Act of 1909." Amplify this statement. (C. U. 1940)

(2) Indicate, in brief, the main changes introduced by (a) the Regulating Act, (b) the Charter Act of 1833, and (c) Act for the Better Government of India, 1858.

(3) What is a "Federation"? 'The outstanding feature of the Government of India Act, 1935, is the provision it makes for the establishment of the Federation of India'. Explain the statement. (C. U. 1940)

(4) What is the present status of the Indian States? Write a short note on the "Narendra Mandal" or the Chamber of Princes.

(5) State the circumstances under which the Crown can intervene in the administration of Indian States.

(6) Write notes on (a) Dyarchy, (b) The Declaration of 1917.

(7) What were the main changes introduced by the Montagu Chelmsford Reforms in the governmental system of India?

Chapter Two

(1) Briefly describe the powers of the Secretary of State for India under the Government of India Act, 1935.

(2) Compare the powers of the Secratary of State for India under the new Aet with those he enjoyed under the Act of 1919.

Chapter Three

(1) What are the 'special responsibilities' of the Governor-General under the Government of India Act, 1935? (C. U. 1940)

(2) Describe the composition of the Federal Legislature under the Government of India Act, 1935. (C. U. 1940)

(3) Write short notes on :—

(i) Advisers and Council of Ministers of the Governor-General under Federation ;

(ii) Indianisation of the Army.

(4) What do you understand by Central (Federal) and Provincial subjects? Enumerate some of them.

(5) Give an outline of the Central Executive and Legislature during the period of transition.

Chapter Four

(1) What do you mean by "Provincial Autonomy"? Mention its chief characteristics. How far do the provinces enjoy it under the new Constitution?

(2) Write notes on (a) the Communal Decision, and (b) Minority representation.

(3) How are the Ministers, appointed in a Governor's Province? Discuss the relation between the Council of Ministers and the Provincial Legislature. (C. U. 1940)

(4) Enumerate the powers and 'special responsibilities' of a Provincial Governor under the Government of India Act, 1935.

(5) Give the composition of the legislature in Bengal ?

(6) What, in your opinion, are the reasons for the creation of a second chamber in Bengal ? Give an outline of its constitution.

Chapter Five

(1) Write what you know of the position of Indian States acceding to the Indian Federation.

(2) What is our "Instrument of Accession ?" What are the conditions which must be satisfied before Federation is proclaimed to be established by the King-Emperor ?

Chapter Six

(1) Write short notes on :—

(i) The Niemeyer Award ;
(ii) Public Debt of India ; and
(iii) Reserve Bank of India.

(2) State and explain the chief heads of revenue and expenditure of *either* the Government of Bengal *or* the Government of Assam, (C. U. 1940).

(3) Give the outline of the budget of the Government of India.

Chapter Seven

(1) Describe the Judicial System in British India.

(2) Write short notes on :—

(i) Federal Court of India (C. U. 1940) ;

(ii) High Courts in British India ; and

(iii) Trial by Jury.

(3) Give an account of the organisation and functions of the District Courts. (C. U. 1940)

Chapter Eight

(1) Discuss the functions of (a) the Advocate General of India, and (b) the Federal Public Service Commission. (C. U. 1940)

(2) What are the special privileges of the services recruited by the Secretary of State ?

(3) Classify the various grades of the Services in India.

Chapter Nine

(1) What is meant by saying that the District Magistrate is the pivot of Indian Administration ?

(2) Describe the functions of *either* the Collector-Magistrate *or* the Deputy Commissioner of a district. (C. U. 1940)

Chapter Ten

(1) Discuss the advantages and value of Local Institutions as agencies for training of the people in the art of self-government.

(2) Enumerate the various institutions of local self-government in Bengal, Also point out the main functions that each of them performs.

(3) Give an outline of the constitution and functions of Municipalities in Bengal? Mention the principal sources of revenue and items of expenditure of an Indian Municipality.

(4) Sketch, in brief, the system of municipal government in Calcutta. Give an outline of the constitution of the Calcutta Corporation.

(5) Describe the system of village self-government in Bengal. (C. U. 1940)

(6) Describe, in brief, the constitution and functions of the District Boards in Bengal.

(7) Show how the Union Boards can help in solving the rural problems of Bengal.